১০ই নভেম্বর

স্মরণে

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ নভেম্বর' ৮৩ অমর হোক
জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হউন
মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী ও
জুম্ম জাতীয় শোক দিবস-২০২৩
১০নভেম্বর
২০২৩ খ্রি.
শুক্রবার
প্রভাতফেরি
হিল উইমেন্স ফেডারেশন

১০ই নভেম্বর স্মরণে

প্রকাশ:
১০ই নভেম্বর ২০২৪

প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭
ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com
ওয়েব: www.pcjss.org

শুভেচ্ছা মূল্য: ৫০ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০৪

প্রবন্ধ ০৬-৩১

জাতীয় ঐক্য প্রসঙ্গে এম এন লারমা এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট – মঙ্গল কুমার চাকমা ০৬

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংবিধান দর্শন – পাভেল পার্থ ১২

বাংলাদেশে সংবিধান সংস্কার: প্রসঙ্গ আদিবাসী জনগণের জন্য ন্যায়বিচার, আত্ম-পরিচয় এবং রাজনৈতিক অধিকার – ড. খায়রুল চৌধুরী ১৯

বঙ্গ, বাঙালী, বাংলাদেশ ও আদিবাসী – শক্তিপদ ত্রিপুরা ২৫

কবিতা ৩২-৩৫

রক্তে রঞ্জিত পাহাড় – শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা ৩২

অগ্নিঝরা পাহাড় – হ্লানুসাং মারমা ৩৩

পাহাড়ে চলো তরুণ – ভদ্রাদেবী তঞ্চঙ্গ্যা ৩৩

নভেম্বর স্মরণে – কাঞ্চনা চাকমা ৩৫

বিশেষ প্রতিবেদন ৩৬-৪৩

খাগড়াছড়ি, দীঘিনালা ও রাঙ্গামাটিতে সাম্প্রদায়িক হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট ৩৬

সাম্প্রদায়িক হামলার বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে প্রতিবাদ ও নিন্দা ৪০

সংবাদ প্রবাহ ৪৪-৭৬

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন ৪৪

সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা ৫২

সেটেলার কর্তৃক হামলা ও ভূমি বেদখল ৫৭

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা ৫৭

সংগঠন সংবাদ ৬০

সম্পাদকীয়

শোকাবহ ১০ই নভেম্বর। জুম্ম জাতির জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং সাবেক সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকী এবং জুম্ম জাতীয় শোক দিবস। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জাতি এবং সর্বোপরি দেশের সকল নিপীড়িত জাতি ও মানুষের জন্য এ এক গভীর শোকাবহ ও তাৎপর্যময় দিন। ১৯৮৩ সালের এই দিনে দিবাগত রাতে পার্টির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা সুবিধাবাদী, উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালিপ্সু গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের এক বিশ্বাসঘাতকতামূলক সশস্ত্র আক্রমণে গুলিবিদ্ধ হয়ে আটজন সহযোদ্ধাসহ শাহদাৎ বরণ করেন জুম্ম জনগণের প্রাণের মানুষ, মহান বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তাঁর এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে সমগ্র জুম্ম জাতিসহ বিশ্বের অধিকারকামী জনগণের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। উক্ত বিশ্বাসঘাতকতামূলক পাশবিক আক্রমণে মহান নেতা এম এন লারমার সাথে আরো শহীদ হয়েছেন- মেজর পরিমল বিকাশ চাকমা (রিপন), সি.আর.সি'র প্রথম সম্পাদক শুভেন্দু প্রভাস লারমা (তুফান), গ্রাপ পরিচালক অপর্ণা চরণ চাকমা (সৈকত), সেঃ লেঃ অমর কান্তি চাকমা (মিশুক), সেঃ লেঃ মনিময় দেওয়ান (স্বাগত), ডাক্তার কল্যাণময় খীসা (জুনি), কর্পোরেল সন্তোষময় চাকমা (সৌমিত্র) ও লেন্স কর্পোরেল অর্জন ত্রিপুরা (অর্জুন)।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে প্রতিনিয়ত কঠিন প্রতিকুলতার মুখে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন করতে গিয়ে পার্টির বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও বীরযোদ্ধা নিজেদের অমূল্য জীবন দান করে গেছেন। এছাড়া আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে নানাভাবে অংশগ্রহণ করার কারণে পার্টির অনেক কর্মী ও সংগ্রামী ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন কারাগারে অন্তরীণ হয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে পঙ্গুত্ব জীবন বরণ করেছেন। অসংখ্য নারী ও শিশু পাশবিক ও নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে অভিশপ্ত জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের এই অমূল্য ত্যাগ ও অবদানের প্রতি জনসংহতি সমিতি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছে এবং সকল শহীদ, বন্দী, পঙ্গু কর্মী ও ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছে।

বিভেদপন্থীদের প্রেতাত্মা ও নব্য বিভেদপন্থীদের চক্রান্ত এখনো অব্যাহতভাবে চলছে। চোরের মায়ের বড় গলার মতো সেই কুচক্রী মহল বড় গলায় 'এগত্তর' বা 'ঐক্য' শ্লোগান তুলে ধরে চলেছে। বস্তুত তারা কখনোই ঐক্য চায়নি এবং তাদের মুখে ঐক্যের ডাক মানায় না। তারা ঐক্যের শ্লোগান তুলে ধরে জনমতকে বিভ্রান্ত করে ঘোলা পানিতে মাছ ধরতে চেয়েছে। তাই তো সমঝোতা চুক্তি করেও চুক্তি ভঙ্গ করে। সমঝোতা বৈঠকে অংশগ্রহণ করলেও সমঝোতায় আসে না। সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া অশুভ ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে জুম্ম জনগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, কথিত ঐ এগত্তর কর্মসূচি হচ্ছে

তাদের চরম এক ভাওতাবাজী। বস্তুত তাদের জন্মই হয়েছে বিভেদপন্থার মধ্য দিয়ে। তাদের এই কথিত এগত্তর কর্মসূচি জুম্ম জনগণের দীর্ঘ ত্যাগ- তিতিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে বাতিলের খাতায় নিয়ে যাওয়ার এক বিপদগামী কার্যক্রম মাত্র।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মহলের মদদে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী সেটেলার গোষ্ঠী ও স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রে সম্প্রতি ১৮, ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর দীঘিনালা-খাগড়াছড়ি-রাঙ্গামাটিতে জুম্মদের উপর নৃশংস সাম্প্রদায়িক হামলা, ঘরবাড়ি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১লা অক্টোবর খাগড়াছড়িতে পুনরায় হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুঠতরাজ ঘটেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা নতুন কিছু নয়। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিশেষ মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় এবারের সাম্প্রদায়িক হামলাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে ২১টি বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে এসব সাম্প্রদায়িক হামলা বার বার সংঘটিত হচ্ছে বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে। এ ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা এবং সে লক্ষ্যে জুম্মদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা, জুম্মদের ভূমি জবরদখল করা, তাদের চিরায়ত জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ করা, সর্বোপরি জুম্মদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করা। জনসংহতি সমিতি সেপ্টেম্বরের সাম্প্রদায়িক হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সেই সাথে সাম্প্রদায়িক হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; নিহত ও আহত ব্যক্তি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সরকারের তরফ থেকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা এবং এই সাম্প্রদায়িক হামলায় জড়িত ব্যক্তিদেরকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করার জোর দাবি জানাচ্ছে।

জুম্ম জনগণের আশা, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর চলমান বৈষম্য ও বঞ্চনা গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন এবং রাষ্ট্র সংস্কারের অংশ হিসেবে এই বৈষম্য ও বঞ্চনা অবসানে আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসবেন। রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া বৈষম্য ও বঞ্চনার অবসানের লক্ষ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এগিয়ে আসবেন- এটাই পার্বত্যবাসীর প্রত্যাশা।

প্র ব ন্ধ

জাতীয় ঐক্য প্রসঙ্গে এম এন লারমা এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট

॥ মঙ্গল কুমার চাকমা ॥

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন সফল করার ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। তাই মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা) জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের গোড়া থেকেই জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। বিশেষ করে ১৯৬২ সালে জুম্ম ছাত্র সম্মেলনে 'গ্রামে চলো, জুম্ম সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দাও, জুম্মদেরকে সচেতন করে তুলো'– এম এন লারমার এই কালজয়ী আহ্বানে ছাত্র-যুব সমাজ গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হয়ে একাধারে শিক্ষকতা ও জুম্ম জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার কাজ এগিয়ে নিতে থাকেন।

ষাট দশকে এম এন লারমার নেতৃত্বে পাহাড়ি ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে একটা রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে। এই সম্মেলনে এম এন লারমা জুম্ম ছাত্র সমাজকে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে জুম্ম সমাজের শিক্ষা বিস্তারসহ জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত করার আহ্বান জানান। সম্মেলনে শ্লোগান উঠে– গ্রামে ফিরে যাও, জুম্ম জনতাকে অধিকার সচেতন করে তোলো, ঘুঁণেধরা প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত নেতৃত্বের উপর আঘাত হানো। এভাবেই এম এন লারমার ডাকে শুরু হলো নতুন পদযাত্রা। এম এন লারমার এই আহ্বান জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করে থাকে এবং নিদ্রামগ্ন জুম্ম জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলে।

সংগঠন হচ্ছে লক্ষ্য পরিপূরণের হাতিয়ার। তাই জুম্ম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়লো জুম্ম জনগণের নিজস্ব একটি রাজনৈতিক দলের। নির্যাতিত ও বঞ্চিত জাতিসমূহের সংগ্রাম ব্যতীত বেঁচে থাকার অন্য কোন বিকল্প পথ নেই। আর সুসংগঠিত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন পরিচালনার জন্য দরকার একটি নিজস্ব রাজনৈতিক দলের। ১৯৭০ সালে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্বাচন পরিচালনা কমিটি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় জীবনের এমনিতর দুর্যোগপূর্ণ দিনে জুম্ম জনগণের পাশে এসে দাঁড়ায় ও দৃঢ়তার সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করে যেতে থাকে। সেই সাথে একটা পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল গঠন করার কার্যক্রমও এগিয়ে চললো। অবশেষে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' নামকরণে ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জুম্ম জনগণের প্রথম রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়।

এম এন লারমা বলেছিলেন, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কাঠামোতে আবদ্ধ জুম্ম জাতি ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। যেহেতু সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও আপোষপন্থী সেহেতু সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারার নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠলো না। বুর্জোয়া অর্থনৈতিক জীবন জুম্ম জাতির জীবনে অতি গৌণ। যেহেতু সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি সবকিছুর গতি নিয়ন্ত্রক সেহেতু বুর্জোয়া অর্থনৈতিক জীবন জুম্ম জাতির সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বেড়া ভেঙে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তবে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক জীবনের প্রভাব জুম্ম জাতির জীবনে পড়েছে। জুম্ম জাতি সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের প্রত্যক্ষ শাসনে ছিল, সেহেতু সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক জীবনের পাশাপাশি এসে দাঁড়ায় বুর্জোয়া অর্থনৈতিক জীবন। বুর্জোয়া অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল দুর্বল, তাই বুর্জোয়া চিন্তাধারার নেতৃত্বে জুম্ম জাতির জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠলো না।

এম এন লারমা বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষি জাতিসমূহ যদিও সবাই সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারায় আবদ্ধ কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে উগ্র জাত্যাভিমান। আপন জাতিসত্তাই বড়– ইহা প্রত্যেক জাতিই প্রাথমিকভাবে চিন্তা করে। তাই উগ্র জাতিসত্তা ভাবনা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধভাবে ভাবতে কখনো সাহায্য করেনি। এমনিতর অবস্থায় মহান নেতা এম এন লারমা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন ভাষাভাষি সকল জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করতে 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ'-এর ধারণা সৃষ্টি করেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন ভাষাভাষি সকল জাতিসমূহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করে তিনি এই জুম্ম জাতীয়তাবাদ দাঁড় করেছিলেন। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জাতিসমূহের ঐক্য-সংহতির ভিত্তি ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে এই জুম্ম জাতীয়তাবাদ।

এম এন লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি এই জুম্ম জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে প্রচারণা চালিয়ে ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম

জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্য-সংহতি গড়ে তুলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন ভাষাভাষি জাতিসমূহ জুম্ম জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে তারা আজ সমষ্টিগতভাবে জুম্ম জাতি হিসেবে দেশে-বিদেশে পরিচিতি লাভ করেছে এবং জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। স্মরণাতীতকাল থেকে একই শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থানের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষি এগারটি জাতির মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও সহাবস্থানের অবিচ্ছেদ্যতা গড়ে উঠেছে। তাই সম্মিলিত শক্তির সমাবেশ ঘটানোর অভিন্ন প্রয়োজনীয়তা ও শাসনতান্ত্রিক অবিচ্ছেদ্যতা জুম্ম জনগণকে বৃহত্তর জুম্ম জাতীয়তাবাদে ঐক্যবদ্ধ হতে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছে।

জুম্ম জাতীয়তাবাদ যাতে উগ্র জাতীয়তাবাদে বা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে পর্যবসিত না হয় সেজন্য মহান নেতা এম এন লারমা প্রগতিশীল নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে জুম্ম জাতীয়তাবাদকে দাঁড় করেছিলেন। যেহেতু সামন্তবাদী চিন্তাধারার মধ্যে অভাব রয়েছে প্রগতিশীলতা ও সংগ্রামী চেতনা আর বুর্জোয়া চিন্তাধারার ভিত্তিও জুম্ম সমাজে অতি নড়বড়ে ও দুর্বল সেহেতু বুর্জোয়া চিন্তাধারা ও সামন্তবাদী চিন্তাধারা স্বাভাবিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও আপোষমুখী হওয়ায় জাতীয় নেতৃত্ব দিতে অক্ষম। ফলত সামন্তবাদী চিন্তাধারা ও বুর্জোয়া চিন্তাধারা জুম্ম জাতির ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষিদেরকে একটি সাধারণ কর্মসূচির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি।

> এম এন লারমা বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষি জাতিসমূহ যদিও সবাই সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারায় আবদ্ধ কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে উগ্র জাত্যাভিমান। আপন জাতিসত্তাই বড়– ইহা প্রত্যেক জাতিই প্রাথমিকভাবে চিন্তা করে। তাই উগ্র জাতিসত্তা ভাবনা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধভাবে ভাবতে কখনো সাহায্য করেনি। এমনিতর অবস্থায় মহান নেতা এম এন লারমা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন ভাষাভাষি সকল জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করতে 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ'-এর ধারণা সৃষ্টি করেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন ভাষাভাষি সকল জাতিসমূহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করে তিনি এই জুম্ম জাতীয়তাবাদ দাঁড় করেছিলেন। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জাতিসমূহের ঐক্য-সংহতির ভিত্তি ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে এই জুম্ম জাতীয়তাবাদ।

এম এন লারমা বলেছেন, প্রগতিশীল ও সংগ্রামী চেতনাই ভিন্ন ভিন্নভাষাভাষি জাতিসমূহের উগ্র জাত্যাভিমান প্রতিহত করতে পারে এবং সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষি জাতিসমূহকে একই সংগ্রামের পতাকাতলে সমাবেশ করতে পারে। প্রগতিশীল ও সংগ্রামী চিন্তাধারা সকল রকমের নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার, তাই প্রগতিশীল চিন্তাধারা সংগ্রামী চেতনাকে সুসংহত করে সংগ্রামের পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। মানবতাবাদ ও গণতান্ত্রিক চেতনা একমাত্র প্রগতিশীল চিন্তাধারার মাধ্যমেই বিকশিত হয়। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতির ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষির উগ্র জাত্যাভিমানকে প্রতিহত করে জুম্ম জাতির ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষির মধ্যে মানবতা ও গণতান্ত্রিক চেতনা জাগিয়ে দিতে পারে একমাত্র প্রগতিশীল চিন্তাধারা। প্রগতিশীল চিন্তাধারা যেহেতু কোন ব্যক্তির স্বার্থ অথবা কোন শ্রেণি-গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে দেয় না, বরং প্রগতিশীল চিন্তাধারা সকল মানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত করে দেয় সেহেতু প্রগতিশীল চিন্তাধারা জাতিবৈষম্য ও উগ্র জাত্যাভিমানকে প্রতিহত করতে পারে এবং তৎপরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত করে মানবতাবাদ, মানুষে মানুষে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা, জাতিতে জাতিতে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। গড়ে তুলতে পারে রাজনৈতিকভাবে সচেতন সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য।

এম এন লারমা এও বলেছিলেন, অবলুপ্তির পথ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতিসমুহের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষিদের সঠিকভাবে মুক্তির পানে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে একমাত্র প্রগতিশীল চিন্তাধারা এবং ঐতিহাসিকগত কারণেই প্রগতিশীল চিন্তাধারা তাই এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এসেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে প্রগতিশীল চিন্তাধারা জুম্ম জাতির ভিন্ন ভিন্ন

ভাষাভাষিদের পথের দিশা দেখিয়ে দিয়েছে। আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতির ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষিরা অবলুপ্তির পথ থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রগতিশীল চিন্তাধারার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়েছে। প্রগতিশীল চিন্তাধারাই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষির আপন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামরূপে গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে।

এম এন লারমা আরো বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবমুখী বাস্তবতার কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম অর্থাৎ জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের সম্মিলিত জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে পরিণত হয়েছে এবং বাস্তবমুখী বাস্তবতার কারণেই প্রগতিশীল চিন্তাধারা পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উৎস হচ্ছে প্রগতিশীল চিন্তাধারা ভিত্তিক জুম্ম জাতীয়তাবাদ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সহজ পথে এগোয়নি। জন্মলগ্ন থেকেই দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারী, প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী মহল বরাবরই জনসংহতি সমিতির আন্দোলনকে গলাটিপে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। বিশেষ করে সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী, আপোষপন্থীদের কাছ থেকে বাধা পেতে থাকে। ১৯৭৩ সালের প্রথমার্ধে পংকজ দেওয়ানের নেতৃত্বে পাহাড়ি যুব সংঘ নামে একটি প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে।

জাতীয় ঐক্যের পথে বাধা হয়েছিল ১৯৭১ সালে গঠিত ট্রাইবাল পিপলস পার্টি (টিপিপি)। মোকাবেলা করতে হয়েছিল পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টির সহযোগী সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সংখ্যালঘুমুক্তি পরিষদ', বামাঞ্জাতা গ্রুপ, রাকাপা প্রভৃতি সশস্ত্র গ্রুপের সাথে সশস্ত্র সংঘাতের। পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি সশস্ত্র আন্দোলনের পশ্চাদভূমি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। অধিকন্তু ঐতিহাসিক কাল থেকে বিশেষ শাসিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষত্বকে এবং এতদাঞ্চলের ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতিসমূহের স্বকীয় সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্রতাকে বিবেচনায় না নিয়ে বাংলাদেশের নিপীড়িত সর্বহারা শ্রেণি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত জুম্ম জাতিসমূহের মধ্যে সাধারণীকরণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে দেশের সর্বহারা আন্দোলনের ক্ষেত্রভূমি হিসেবে ব্যবহারের পাঁয়তারা করে। এতে করে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি থেকে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বাধীন জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের বিরোধিতা আসতে থাকে।

সর্বহারা পার্টির সশস্ত্র গ্রুপের সাথে জনসংহতি সমিতির তৎকালীন সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনীর অনেক সশস্ত্র সংঘাত হয়েছিল। শান্তিবাহিনীর প্রতি জনসমর্থন, সদস্যদের প্রচন্ড সাহস ও সামরিক অভিজ্ঞতার কারণে প্রতিবারই সর্বহারা পার্টির সদস্যরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছিল। এভাবে সর্বহারা পার্টির সাথে একের পর পর এক যুদ্ধে জয়যুক্ত হওয়ার ফলে শান্তিবাহিনী সদস্যদের প্রতি জনগণের সমর্থন জোরালো হয়ে উঠে। বস্তুত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তা, সামরিক শৃঙ্খলা, যুদ্ধের নির্ভুল রণনীতি ও রণকৌশল, ব্যাপক জনসমর্থন ইত্যাদি বিষয়সমূহ সর্বহারা পার্টিসহ অন্যান্য সশস্ত্র দলগুলোর সাথে সংঘটিত যুদ্ধে শান্তিবাহিনী সদস্যদের জয়লাভ করতে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যুগে যুগে যেমন প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আন্দোলনে কখনো হয়েছিল বিপ্লবী সংগ্রামী, আবার কখনো হয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও আপোষপন্থী। জুম্ম জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনেও প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী চিন্তাধারার লোকেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে পার্টিতে কাজ করে আসছিল। তারা কখনো সেজেছিল প্রকৃত দেশপ্রেমিক, কখনো সেজেছিল বিপ্লবী, কখনো সেজেছিল বাস্তববাদী প্রগতিশীল ব্যক্তি, আবার কখনো হয়েছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী। সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে অভিনব রূপ ধারণ করেছিল। কিন্তু এম এন লারমা অতি দক্ষতার সাথে সুকৌশলে এসবের মোকাবেলা করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজ যেহেতু যুগ যুগ ধরে অবহেলিত, নির্যাতিত, বঞ্চিত ও পশ্চাদপদ, এবং যেহেতু বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীও জুম্ম জনগণের তুলনায় সবদিক থেকে বেশি শক্তিশালী, তাই নিজেদের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই। জুম্ম জাতি যুগ যুগ ধরে সামন্ত ও উপনিবেশিক শাসনে শাসিত হয়ে আসছে; যেহেতু সেই শাসিত শ্রেণি থেকে সংগ্রামী ও অধিকার সচেতন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন করতে তার জন্য যথেষ্ট সময়ের দরকার। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে মহান নেতা এম এন লারমার প্রদর্শিত পথে জনসংহতি সমিতি সংগ্রামের নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করে যে, নীতিগতভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়া ও কৌশলগতভাবে জাতি-ধর্ম-দল-মত নির্বিশেষে সাহায্য চাওয়া ও বন্ধু গড়ে তোলা; এবং নীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করা ও কৌশলগতভাবে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই করা। কিন্তু পার্টির মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুবিধাবাদী, ক্ষমতার উচ্চাভিলাষী, দুর্নীতিবাজ ও দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের তাবেদার ভবতোষ দেওয়ান

(গিরি), প্রীতি কুমার চাকমা (প্রকাশ), দেবজ্যোতি চাকমা (দেবেন) ও ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান (পলাশ) চক্র জনসংহতি সমিতির এই বস্তুবাদী ও প্রগতিশীল আদর্শ ও নীতি-কৌশলকে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা তাদের হীন মুখোশ পার্টির মধ্যে বেশি দিন লুকিয়ে রাখতে পারেনি।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে ও ক্ষমতার লোভে উচ্চাভিলাষী হয়ে, সর্বোপরি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক গুপ্তচর, দালাল ও ফক্করদের চক্রান্তে জড়িত হয়ে এক উপদলীয় চক্রান্ত শুরু করে দেয়। তখন সুদক্ষ কাণ্ডারী দলীয় নেতা এম এন লারমা খুবই শান্ত, ধীর ও গঠনমূলক অথচ অতীব যুক্তিযুক্ত অভিভাষণে বাস্তব পরিস্থিতি সঠিক মূল্যায়ন করে গোটা পার্টি ও জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনের উপর ঐতিহাসিক রূপরেখা শোনালেন।

তিনি বললেন– "দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের খাতিরে কি দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে? আসলে এই প্রশ্নের উৎপত্তির কারণ হচ্ছে অসহিষ্ণুতা ও অধৈর্য থেকে। সংগ্রাম দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে যাক, শান্তি ফিরে আসুক দ্রুত– এই কামনা সবাইয়ের। কিন্তু কারোর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী বা দ্রুত নিষ্পত্তি হয় না। বাস্তবমুখী বাস্তবতা ও আত্মমুখী প্রস্তুতির নিরিখেই সংগ্রামের গতি নির্ধারিত হয়। তাই জনসংহতি সমিতিকে অবশ্যই আত্মমুখী প্রস্তুতি বা বাস্তবমুখী বাস্তবতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সংগ্রামের প্রতিটি কার্যক্রমকে নির্ধারণ করতে হবে। রণনীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী অর্থাৎ আত্মমুখী প্রস্তুতি সত্যিকারভাবে বাস্তবমুখী বাস্তবতার সাথে সমন্বয় সাধন করে রচনা করা হয়েছে কিনা– এটিই হচ্ছে সংগ্রামের কার্যক্রমের প্রধান ধারা। বাস্তবতাকে এড়িয়ে, বাস্তবতাকে অস্বীকার করে আত্মমুখী প্রস্তুতির অর্থ হচ্ছে সংগ্রামকে বিপথে পরিচালিত করা, সংগ্রামকে বানচাল করা। তাই জনসংহতি সমিতিকে এজন্য অবশ্যই সচেতন হওয়া উচিত। কর্মীবাহিনীকে অবশ্যই অসহিষ্ণুতা ও অধৈর্যের বিরুদ্ধে নিরলসভাবে সংগ্রাম করতে হবে। এই অসহিষ্ণুতা ও অধৈর্য হঠকারীতাবাদ, রক্ষণশীলতাবাদ ও পলায়নবাদের প্রবণতা প্রকাশ করে দেয়।"

জুম্ম জাতির বৃহত্তর স্বার্থে পার্টির সভাপতি এম এন লারমা বিভেদপন্থী উপদলীয় চক্রান্তকারীদেরকে পুনরায় বৈঠকে বসার জন্য আহ্বান জানালেন। এই ক্ষমা ঘোষণায় তিনি তাঁর মহানুভবতার ও ক্ষমাশীলতার এক নজির স্থাপন করে জাতীয় ইতিহাসে মহান নেতার পরিচয়ে আরেকবার স্বাক্ষর রাখলেন। এম এন লারমার সভাপতিত্বে ১৯৮৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত বিভেদপন্থীদের সাথে উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন তথা জুম্ম জাতির মহান স্বার্থে গণতন্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে 'ভুলে যাওয়া ও ক্ষমা করা' নীতির ভিত্তিতে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এই নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া অনতিবিলম্বে পরস্পরে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ বন্ধ করা, আটকাধীন সদস্যদেরকে সসম্মানে মুক্তি প্রদান, বিভেদপন্থীদের থেকে দখলকৃত অবৈধ ও গোপনীয় দলিলপত্র ও নীল-নকশা নষ্ট করাসহ পুনর্মিলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বস্তুত উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু দূর অগ্রগতিও সাধিত হয়। অস্ত্র সংবরণ ও বন্দী সদস্যদের মুক্তিও দেয়া হয়, আর পুনর্মিলনের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে যোগাযোগও হতে থাকে। সারাদেশেও কর্মী বাহিনীতে একটা শান্তি ও স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে। পার্টির সর্বস্তরে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের একটা মানসিক অবস্থা ও পরিবেশ বিরাজ করতে থাকে। কর্মীবাহিনীর মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। সবাই হাতে হাত মিলালো। কর্মীবাহিনী খুশীতে আত্মহারা হয়ে উঠে। আগের মতো এবার শুরু হবে অধিকতর দুর্বার আন্দোলন।

কিন্তু জুম্ম জাতীয় কুলাঙ্গার, উচ্চাভিষাষী ও ক্ষমতালোভী চক্রান্তকারী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র জাতীয় স্বার্থের সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ও দালালদের উস্কানীতে উচ্চ পর্যায়ের গৃহীত সিদ্ধান্তের কালি শুকোতে না শুকোতে ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ সালে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে এক অতর্কিত সশস্ত্র হামলায় আটজন সহযোদ্ধাসহ মহান নেতা এম এন লারমাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। গৃহযুদ্ধের কারণে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা অপূরণীয়। তবুও ফলাফলে নীতিগতভাবে পার্টি অনেক উপকৃত হয়েছে। যদিও জুম্ম জনগণ জাতীয় চেতনার অগ্রদূত, জাতির কর্ণধার ও পার্টি প্রতিষ্ঠাতা এম এন লারমাকে চিরতরে হারিয়েছে, হারিয়েছে অনেক বীর বিপ্লবী সহযোদ্ধাকে, তথাপি দলের অভ্যন্তরে যে সুবিধাবাদ এতদিন বিরাজ করছিল, তা মূলচ্ছেদ হয়েছিল। দলের ভেতরকার এসব সুবিধাবাদী বিভেদপন্থীদের বিতাড়নের ফলে দল আগের চেয়ে আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ গোড়া থেকেই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান চেয়ে আসছিল। সেলক্ষ্যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে জুম্ম জনগণ বাংলাদেশ সরকারের কাছে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের অধীনে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি অব্যাহতভাবে জানিয়ে আসতে থাকে এবং জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে ধর্না দিতে থাকে। কিন্তু গণতান্ত্রিক উপায়ে একের পর এক দাবি-দাওয়া ও ডেপুটেশন

প্রদান করেও সমস্যার বিন্দুমাত্র সমাধান না হওয়ায় কিংবা সমস্যা সমাধানে দেশের শাসকগোষ্ঠী বিন্দুমাত্র এগিয়ে না আসায় জুম্ম জনগণ চরম হতাশাগ্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। অধিকন্তু ১৯৭৫ সালে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করার সকল পথ রুদ্ধ হলে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণ সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল।

সশস্ত্র আন্দোলনের পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সরকারের সাথে বরাবরই সংলাপের পথ খোলা রেখেছিল এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য বার বার সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসতে থাকে। বস্তুত জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সশস্ত্র আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে তখন সরকার ও সরকারি বাহিনী প্রবল চাপের মধ্যে পড়ে। দুর্বার সশস্ত্র আন্দোলনকে মোকাবেলা করতে গিয়ে নিরীহ জুম্ম জনগণের উপর সরকারি বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন বৃদ্ধি পেলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরেও সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে উঠে। সামরিক উপায়ে, অর্থনৈতিক উপায়ে, লক্ষ লক্ষ মুসলমান বাঙালি বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, ভাগ করো শাসন করো নীতির ভিত্তিতে নানা ষড়যন্ত্র চালিয়েও জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে দমন করতে না পেরে এবং দেশে-বিদেশে প্রবল চাপের মধ্যে পড়ে বিভিন্ন সরকার আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের পথ খুঁজতে বাধ্য হয়েছিল।

তারই ফলশ্রুতিতে প্রথমে জেনারেল জিয়া সরকার আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু এক সামরিক অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হলে সেই উদ্যোগ ভেস্তে যায়। এরপর জেনারেল এরশাদ সরকারও সংলাপের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসলে একপর্যায়ে ১৯৮৫ সালে এরশাদ সরকারের সাথে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক শুরু হয়। উক্ত বৈঠকে সরকারি প্রতিনিধিদল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। উক্ত বৈঠকের ধারাবাহিকতায় এরশাদ সরকারের সাথে ৬ বার, তৎপরবর্তী খালেদা জিয়া নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের সাথে ১৩ বার (মূল কমিটির সাথে ৭ বার ও সাব-কমিটির সাথে ৬ বার) এবং সর্বশেষ শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে ৭ বার বৈঠকের পর অবশেষে ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঢাকাস্থ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ঐতিহাসিক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে না হতেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে বিরোধিতা করে বিভেদপন্থী চক্রদের প্রেতাত্মা প্রসিত বিকাশ খীসা, রবি শংকর চাকমা ও সঞ্চয় চাকমার নেতৃত্বে পাহাড়ি গণপরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের একটি অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে এই অভিযোগে যে, এই চুক্তির মাধ্যমে জুম্ম জনগণের অনেক দাবি জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর পাহাড়ি গণপরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনকে ভেঙ্গে একটি ক্ষুদ্র অংশকে নিয়ে চুক্তি বিরোধী এই গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রে 'ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' (ইউপিডিএফ) নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। এভাবে ইউপিডিএফ জুম্ম জনগণের জাতীয় ঐক্যের উপর আঘাত হানে। ঐক্য-সংহতির উপর আঘাত হেনে জুম্ম জনগণের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতির সূত্রপাত ঘটায়।

তবুও জুম্ম জনগণের সামগ্রিক স্বার্থে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাত বন্ধের জন্য জনসংহতি সমিতি ইউপিডিএফের সাথে সংলাপে বসেছিল। তারই ফলশ্রুতিতে জনসংহতি সমিতি ও ইউপিডিএফর মধ্যে কয়েকবার সমঝোতা হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম হলো ২০০০ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ির নারানখিয়ায় অনন্ত বিহারী খীসার বাড়িতে এক সমঝোতা চুক্তি, যেখানে "(১) ইতিমধ্যে যারা অপহৃত হয়েছেন তাদের উদ্ধারকল্পে উভয় পক্ষ পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান করবে; (২) উভয় পক্ষ চলাফেরা কালীন কোন প্রকার বাধা, ধর-পাকড় করবে না এবং মিটিং মিছিলে কোন পক্ষ প্রতিপক্ষকে বাধা প্রদান করবে না এবং (৩) যোগাযোগের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আলোচনায় বসার দিন, তারিখ ও জায়গা ঠিক করা হবে" ইত্যাদি সমঝোতা ছিল। কিন্তু এই সমঝোতা বেশিদিন টেকেনি। প্রসিত-রবিশংকর গ্রুপের একগুয়েমীর ফলে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত ছাড়াই সেই সংলাপের অপমৃত্যু ঘটে বলে উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। প্রসিত খীসার একগুয়েমী ও স্বৈরাচারী মানসিকতার কারণে ও নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনেক শীর্ষস্থানীয় ও বিভিন্ন স্তরের কর্মী ইউপিডিএফ ত্যাগ করেছিলেন।

২০০৭-২০০৮ সালে দেশে জরুরি অবস্থার সময় যখন জরসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীদের উপর রাষ্ট্রীয় বাহিনীর প্রচন্ড দমন-পীড়ন চলছিল, সেই সময় রাষ্ট্রীয় বাহিনীর

সহযোগিতায় ইউপিডিএফ জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি ও রাজস্থলীতে তাদের সশস্ত্র তৎপরতা সম্প্রসারিত করে। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর মতো ইউপিডিএফ ২০০৬ সালে ইউপিডিএফের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জেএসএস সদস্যদের প্রতি 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা করে এবং ২০০৭ সালে বিজুর মধ্যে ইউপিডিএফর নিকট আত্মসমর্পণ করতে সময়সীমা বেঁধে দেয়। এ থেকে বুঝা যায় ইউপিডিএফের ঐক্যের আহ্বান স্রেফ ভাওতাবাজি বৈ কিছু নয়।

জনমতের চাপে পড়ে ইউপিডিএফ কখনো কখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে সমর্থন করার কথা এবং জনসংহতি সমিতির চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে সহযোগিতা প্রদানের কথা প্রচার করে থাকে। তার মধ্যে ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে ইউপিডিএফ একেবারে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। কিন্তু পার্বত্য চুক্তির প্রতি ইউপিডিএফ সমর্থনদানের কথা বললেও পার্বত্য চুক্তির প্রতি তাদের দলীয় কর্মসূচি ও সাহিত্যে নীতিগত অবস্থানের কোন পরিবর্তন করেনি। জনসংহতি সমিতি যখনি চুক্তি বাস্তবায়নের কর্মসূচি ঘোষণা করে, তখনি সেই কর্মসূচির বিরুদ্ধে বা সেই কর্মসূচি বানচাল করতে ইউপিডিএফ মরিয়া হয়ে উঠে। পার্বত্য চুক্তির প্রতি ইউপিডিএফের এই সমর্থনের কথা স্রেফ জনমতকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে বলা হয়ে থাকে। সরকারি বাহিনী তথা শাসকশ্রেণির আশ্রয়-প্রশ্রয়ে প্রসিত-রবিশঙ্কর গ্রুপ তথা ইউপিডিএফের সশস্ত্র প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জনসংহতি সমিতি নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন এগিয়ে যেতে থাকে।

২০১৬-১৭ সালের দিকে জনসংহতি সমিতি ইউপিডিএফের সাথে আবার সমঝোতার জন্য আলোচনায় বসে। সেসময় ইউপিডিএফকে প্রস্তাব দেয়া হয় যে, সমঝোতা করতে হলে একটা ভিত্তি দরকার। আর সেই ভিত্তি হতে পারে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। কারণ এটা দেশে-বিদেশে সমাদৃত একটা চুক্তি। সেসময় সেই প্রস্তারের বিরুদ্ধে ইউপিডিএফ পাল্টা যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করলেও পরে স্বীকার করে নেয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নকে ভিত্তি করে সমঝোতা হতে পারে। সেসময় ইউপিডিএফকে আরো বলা হয়েছে, সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন আন্দোলনের একমুখী নেতৃত্বে। নানা যুক্তি পাল্টা যুক্তির পর ইউপিডিএফ সেই প্রস্তাবও মেনে নেয়। ইউপিডিএফের প্রতিনিধিদল বলে যে, তারা উর্ধতন নেতৃত্বের সাথে কথা বলে সেই প্রস্তাবের উপর সিদ্ধান্ত জানাবেন। অন্যদিকে তাদের কর্মীদের বুঝাতে একটু সময় লাগবে। তারপর থেকেই ইউপিডিএফ কেবল সময় নিয়েছেন কিন্তু কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি। এমনকি কোভিড-১৯ মহামারির প্রাক্কালে ২০১৯-২০২০ সালে বৈঠকের জন্য জনসংহতি সমিতি আবারও প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ইউপিডিএফ নানা শর্ত আরোপ করায় সেই সংলাপ শুরু হতে পারেনি।

সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ 'এগত্তর' (ঐক্য) নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। বিবৃতি-বক্তব্য দিয়ে ইউপিডিএফ এমনভাবে প্রচার করেছে যে, "একমাত্র তারাই ঐক্য চায়। জনসংহতি সমিতি ঐক্য চায় না।" বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ১৯৭২ সালে জনসংহতি সমিতির আর্বিভাব ঘটেছে জুম্ম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে ১৯৯৮ সালে ইউপিডিএফের জন্ম হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে বিরোধিতা করে এবং জুম্ম জনগণকে বিভাজন করে।

বস্তুত ইউপিডিএফ কখনোই ঐক্য চায়নি। তারা ঐক্যের শ্লোগান তুলে ধরে জনমতকে বিভ্রান্ত করে ঘোলা পানিতে মাছ ধরতে চেয়েছে। তাই তো সমঝোতা চুক্তি করেও চুক্তি ভঙ্গ করে। সমঝোতা বৈঠকে অংশগ্রহণ করলেও সমঝোতায় আসেনি। জুম্ম জনগণ সাম্প্রতিক পাহাড়ে ঘটে যাওয়া অশুভ ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ইউপিডিএফের কথিত ঐ এগত্তর কর্মসূচি হচ্ছে চরম এক ভাওতাবাজী। এভাবেই আজ নব্য বিভেদপন্থী ইউপিডিএফ জুম্ম জনগণের জাতীয় ঐক্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় অবতীর্ণ হয়েছে।

'পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিত জাতিকে, অগ্রসর জাতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দেশ করে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না।'

–মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংবিধান দর্শন

জুলাই গণঅভ্যুত্থান, রাষ্ট্র সংস্কার ও আদিবাসী জাতিসমূহের অংশীদারিত্ব

॥ পাভেল পার্থ ॥

সংবিধানকে বহুজন রাষ্ট্রের জনআকাংখার সামাজিক চুক্তি হিসেবে বয়ান করেন। তাহলে সংবিধানের দর্শন কী? কোনো একক দর্শন ধারার ভেতর দিয়ে কী সংবিধান বাহিত হয়? সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তি বা রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে বহু তর্ক জারি আছে। সংবিধানের কাঠামো, বৈশিষ্ট্য কিংবা প্রয়োগ নিয়েই আলাপ বেশি হয়। বরং প্রান্তিক হয়ে থাকে সংবিধানের দার্শনিক পরিসর। ছাত্র-জনতার জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ময়দানে রাষ্ট্র সংস্কার, রাষ্ট্র মেরামতি, সংবিধান বিতর্ক এবং নয়া রাজনৈতিক বন্দোবস্তীর আওয়াজ ওঠেছে। রাষ্ট্র বিনির্মাণ ও সংবিধান প্রশ্নে জনআকঙক্ষার দার্শনিকতাকে কীভাবে পাঠ করা হবে সেই আলাপখানিও জরুরি। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংবিধান দর্শনকে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের সংস্কার প্রশ্নে জরুরি বার্তা হিসেবে হাজির করছে চলতি আলাপ। ১৯৭২ সালের গণপরিষদে সংবিধান প্রশ্নে লারমার তর্ক এবং জিজ্ঞাসাগুলো সর্বদা প্রাসঙ্গিক। লারমা মূলত সংবিধানকে রাষ্ট্রের শ্রেণি-বর্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের আকাঙ্ক্ষা ও আওয়াজের প্রতিফলন হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। লারমার সংবিধান দর্শন মূলত এক ইনক্লুসিভ ও বহুত্ববাদী দার্শনিকতাকে ধারণ করে। কাঠামোগত বৈষম্য এবং উৎপাদন ব্যবস্থার মতো মৌলিক জিজ্ঞাসাকে লারমা রাজনৈতিক বয়ান হিসেবে সংবিধান প্রশ্নে হাজির করেছেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যে ইনক্লুসিভ বাংলাদেশের আওয়াজ ওঠেছে, তার স্পষ্টত জিজ্ঞাসা লারমা করে গেছেন। আজ আমাদের লারমাকে খুব বেশি পাঠ করা জরুরি। তাঁর সংবিধান দর্শন ও জিজ্ঞাসাকে রাষ্ট্র সংস্কারের বাহাসে গুরুত্ব দিয়ে আনা জরুরি।

> বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতি-সত্ত্বার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু সেই সব জাতির কথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই খসড়া সংবিধানে নাই। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কীভাবে ভুলে গেলেন আমার দেশের কথা -- পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা। এখানে বিভিন্ন জাতি বাস করে। এখানে চাক্মা, মগ, ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরুং এবং চাক এইরূপ ছোট ছোট দশটি উপজাতি বাস করে (যদিও লারমা তঞ্চংগ্যা, রাখাইন, অসমীয়া, গোর্খা কিংবা সাঁওতালদের কথা ভুলে গিয়েছিলেন!)। এই মানুষের কথা আমি বলতে চাই।

আত্মপরিচয় ও 'জাতীয়তা বিতর্ক'

মুক্তিযুদ্ধের পর, স্বাধীন দেশের প্রথম সংবিধান রচিত হয় পৃথিবীর এক প্রাচীন পত্রঝরা বনে। মধুপুর শালবনের দোখোলা ফরেস্ট বাংলো থেকে রচয়িতাগণের সাথে আশেপাশের মান্দি ও কোচ আদিবাসীদের আলাপ হয়েছে। ১৯৬২ সালে যখন বনের আদিবাসী সভ্যতাকে অস্বীকার করে এই বনকে সংরক্ষিত জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়, তখন আদিবাসীরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। প্রতিবাদলিপিতে তারা লিখেছিলেন, 'আমরা মধুপুর বনের আদিবাসী জনগণ'। পাবর্ত্য চট্টগ্রামে না হলেও, চাবাগানসহ সমতলে 'আদিবাসী' প্রত্যয়খানি সেইসময়েই বহুল ব্যবহৃত পরিচয়। ১৯৪৩ থেকে দেশের বহুজায়গায় বহু বিদ্যালয়ের নামে আদিবাসী শব্দখানি আছে। যাহোক মধুপুর শালবনের আদিবাসী অঞ্চলে সংবিধান রচিত হলেও, প্রথম থেকেই সংবিধানে আদিবাসী আত্মপরিচয়কে অস্বীকার করে এবং প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে প্রবল জাত্যাভিমান। একতরফাভাবে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের

সাংবিধানিক পরিচয় নির্ধারিত হয় 'বাঙালি'। মানবন্দ্রে নারায়ণ লারমা জাত্যাভিমানী এই প্রবণতাকে প্রশ্ন করেছেন এবং রাষ্ট্রীয় পরিসরে প্রথম জাতীয়তা বিতর্কের কাঠামোগত জিজ্ঞাসা হাজির করেছেন।

১৯৭২ এবং পরবর্তীতে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর সময় ২০১১ সালেও আদিবাসী-আত্মপরিচয়ের তর্ক ওঠেছিল। দুটি সময়েই সংবিধান কমিটির রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন সাংসদ সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী। দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর 'আদিবাসী আত্মপরিচয়কে' কীভাবে জাতীয়তাবাদী কর্তৃত্ববাদ দিয়ে অস্বীকার করেছেন তার কিছুটা প্রথম দেখা যাক। ১৯৭২ সালের গণপরিষদ বিতর্কে তৎকালীন সাংসদ সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে বলেছিলেন, ...একটি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার চাইতে একটি জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া কি অধিক মর্যদাজনক নয়?[১] ৪০ বছর পর একইনেতা জাতীয় সংসদে ২০১১ সালে আদিবাসী জনগণকে সংবিধানে 'উপজাতি' হিসেবে স্বীকৃতির জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। ২০১১ সালের ৮ জুন সংশোধনী প্রতিবেদন সংসদে পেশকালে তিনি বলেন, ...মাননীয় স্পীকার, এদেশের নাগরিকদের মধ্যে বিভিন্ন উপ-জাতিসহ অন্যান্য জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের নাগরিক রয়েছে। তাদের আঞ্চলিক, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জীবনধারা ইত্যাদি সংরক্ষণ ও বিকশিত করার বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন বলে কমিটি মনে করে[২]। পরবর্তীতে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে উল্লেখ করা হয়, ...রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।[৩] সংবিধানে 'আদিবাসী' শব্দটি নাই, একইসাথে 'ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী' বলতেও কোনো শব্দ নাই। কিন্তু রাষ্ট্র তার বহু প্রতিষ্ঠান, আইন, নথি এবং প্রকল্পে সর্বদাই 'ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী' এই অসাংবিধানিক শব্দটিই প্রশ্নহীনভাবে ব্যবহার করেছে। 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০' শীর্ষক একটি আইনও তৈরি হয়েছিল বিগত কর্তৃত্ববাদী রেজিমে।

১ দেখুন: বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনা। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

২ দেখুন: নবম জাতীয় সংসদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষ কমিটির রিপোর্ট। জৈষ্ঠ্য ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, জুন ২০১১ খ্রীস্টাব্দ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পৃ.৫

৩ দেখুন: ধারা-২৩ ক। উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি। পঞ্চদশ সংশোধনী, সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

এখন আমরা দেখার চেষ্টা করবো আদিবাসী আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার তর্ক-জিজ্ঞাসাগুলো কি ছিল? সায়ত্বশাসিত অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি নিজস্ব আইন পরিষদ, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ন্যায় সংবিধিব্যবস্থা, রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত ছাড়া কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন না করা এই চারটি দাবি লারমা ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রের কাছে পেশ করেছিলেন। আত্মপরিচয় ও জাতীয়তা বিষয়ে ১৯৭২ সালের গণপরিষদের তৎকালীন বিতর্ক ও আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো (সূত্র উল্লেখসহ বানান এবং বাক্য অবিকল রাখা হয়েছে) আমরা চলতি আলাপে তুলে ধরছি।

শ্রী লারমা: মাননীয় ডেপুটি স্পীকার সাহেব, তাই আজকে বঞ্চিত মানুষের মনের কথা আমি আপনার মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই। এই খসড়া সংবিধানে আমাদের অবহেলিত অঞ্চলের কোন কথা নাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিত জাতিকে, অগ্রসর জাতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দেশ করবে। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না। (লারমার পরে) জনাব এনায়েত হোসেন খান বলেন)

জনাব এনায়েত হোসেন খান এডভোকেট (বাখেরগঞ্জ-৯): ...এটা একটা আইন সভা নয়, এটা একটা গণপরিষদ, সুতরাং এখানে কোন এলাকা ভিত্তিক আলোচনা চলতে পারে কিনা। এ সম্বন্ধে আপনার কাছে রুলিং চাই।[৪]

মাননীয় স্পীকার, আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। আমাকে বার বার বাধা দেওয়া হচ্ছে। অনেক মাননীয় সদস্য আমাকে বাধা দিচ্ছেন। যার ফলে আমি আমার ....

জনাব ডেপুটি স্পীকার: আপনাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারও নাই। আপনি মন খুলে বলে যান আপনার বক্তব্য[৫]

শ্রী লারমা: বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতি-সত্ত্বার অস্তিত্ত্বের কথা অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু সেই সব জাতির কথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই খসড়া সংবিধানে নাই। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কীভাবে ভুলে গেলেন আমার দেশের কথা -- পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা। এখানে বিভিন্ন জাতি বাস

৪ দেখুন: বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয় ঃ সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনা। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

৫ প্রাগুক্ত

করে। এখানে চাক্‌মা, মগ, ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরুং এবং চাক এইরূপ ছোট ছোট দশটি উপজাতি বাস করে (যদিও লারমা তঞ্চংগ্যা, রাখাইন, অসমীয়া, গোর্খা কিংবা সাঁওতালদের কথা ভুলে গিয়েছিলেন!)। এই মানুষের কথা আমি বলতে চাই।

জনাব নূরুল হক: মাননীয় সদস্য বলেছেন, সংবিধানে উপজাতিদের অধিকারের কোন কথা নাই। আপনার মাধ্যমে তার দৃষ্টি আর্কর্ষণ করে বলতে চাই, সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে সকল প্রকার জাতির, কৃষক শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহের অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের সর্বপ্রকার শোষণ মুক্তি দানের কথা আছে। মাননীয় সদস্য ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন।

শ্রী লারমা: আমরা করুণার পাত্র হিসাবে আসিনি। আমরা এসেছি মানুষ হিসাবে। তাই মানুষ হিসাবে বাঁচবার অধিকার আমাদের আছে।

মিসেস সাজেদা চৌধুরী: বৈধতার প্রশ্ন, জনাব স্পীকার সাহেব, শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলতে চেয়েছেন যে, এই সংবিধানে তাদের উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আমি বলব, তারাও আজকে স্বাধীন। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর সঙ্গে তাদেরও একটা জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একটি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার চাইতে একটি জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া কি অধিক মর্যদাজনক নয়?

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি একজন মানুষ যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি, যে জন্মভূমিতে আজন্ম লালিত পালিত হয়েছি, সেই জন্মভূমির জন্য আমার যে কথা বলার রয়েছে, সে কথা যদি প্রকাশ করতে না পারি, যদি এই সংবিধানে তার কোন ব্যবস্থাই দেখতে না পাই, তাহলে আমাকে বলতে হবে যে, বঞ্চিত মানুষের জন্য সংবিধানে কিছুই রাখা হয়নি। বঞ্চিত মানুষের সংবিধান এটা কিছুতেই হবে না এবং মানুষ এটাকে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবে[৬]।

জনাব আবদুর রাজ্জাক ভুঁইয়া: মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি প্রস্তাব করছি যে,

> সংবিধান বিলের ৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশ করা হোক:
>
> "৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকদের বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইবেন।"

৬ প্রাগুক্ত

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার সাহেব, বাংলাদেশের নাগরিকগণকে বাঙ্গালী বলে পরিচিত করবার জন্য জনাব আব্দুর রাজ্জাক ভূঁইয়ার প্রস্তাবে আমার একটু আপত্তি আছে যে, বাংলাদেশের নাগরিকত্বের যে সংজ্ঞা, তাতে করে ভালভাবে বিবেচনা করে তা যথোপযুক্তভাবে গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি। আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙ্গালীদের সঙ্গে লেখা পড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দপুরুষ কেউ বলে নাই, আমি বাঙ্গালী। আমার সদস্য-সদস্যা ভাই-বোনদের কাছে আমার আবেদন, আমি জানি না, আজ আমাদের এই সংবিধানে আমাদেরকে কেন বাঙ্গালী বলে পরিচিত করতে চায়।

জনাব স্পীকার: আপনি কি বাঙ্গালী হতে চান না?

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদিগকে বাঙ্গালী জাতি বলে কখনো বলা হয় নাই। আমরা কোনদিনই নিজেদেরকে বাঙ্গালী বলে মনে করি না। আজ যদি এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানের জন্য এই সংশোধনী পাশ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই চাকমা জাতির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশী বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙ্গালী বলে নয়[৭]।

.... (সংশোধনী পাশ হয়ে যায়) ....

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার, আমাদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে খর্ব করে এই ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ সংশোধিত আকারে গৃহিত হল। আমি এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ স্বরূপ আমি অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য গণপরিষদের বৈঠক বর্জন করছি।

...........(অতপর মাননীয় সদস্য পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান) ....

সৈয়দ নজরুল ইসলাম(শিল্পমন্ত্রী): ...... আমি পরিষদের তরফ থেকে দাঁড়িয়েছি। কারণ, আমাদের একজন মাননীয় সদস্য বাবু শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আজকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেছেন। এর চেয়ে মর্মান্তিক, এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা এই পরিষদে আর ঘটে নাই। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ৫ লক্ষ উপজাতি রয়েছে, তারা বাঙ্গালী।

৭ বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: সংবিধান-বিল বিবেচনা (দফাওয়ারী পাঠ), খন্ড ২ সংখ্যা ১৩। মঙ্গলবার, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭২

তারা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর অঙ্গ বলে আমরা মনে করি। কালকে আমাদের আইন-মন্ত্রী বলেছেন যে, তাঁদের প্রতি দীর্ঘ দিন যাবৎ তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁদের সংসদীয় আইনের আওতা এবং বাইরের সভ্য জগতের আইনের আওতার বাইরে রেখে বিছিন্ন মনোভাবের সুযোগ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা দিয়েছিল। আমরা তা চাই না, আমরা চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিকরা সারা বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের সমমর্যদাসম্পন্ন হবে। তা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫ লক্ষ অধিবাসী বাঙ্গালী জাতির গর্ব হিসাবে থাকবে। আমি আশা করি, এই ঐক্য, এই জাতীয়তাবাদ বিনষ্ট করার জন্য কেউ প্রচেষ্টা চালাবেন না। যদি চালান, তাহলে সারা জাতির অন্তরে ব্যথা দেওয়া হবে।

পরিচয় এক সতত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অভিধা। পরিচয় নির্মাণ-বিনিমার্ণের রাজনীতি, অধিপতি রাষ্ট্রের উপস্থাপনের ক্ষমতা ও বাহাদুরি সর্বদা নিম্নবর্গের আত্মপরিচয়কে অপর ও আড়াল করে। একটা সময় পাঠ্যবইতে রাষ্ট্র লিখেছিল, সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য ভাত, পিঁপড়া ও মদ। দেশব্যাপি বহু আদিবাসী স্থাননাম জোর করে বদলে দেয়া হয়েছে। অধিপতি বয়ানে আদিবাসী জাতিগত নামগুলোও বদলে যায়। ১৯৭২ সনের গণপরিষদসভায় তৎকালিন স্পীকার দেখা গেছে কোনো বাঙালি সাংসদের নাম ভুলভাবে বা বিকৃত করে উচ্চারণ করেননি, একমাত্র মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছাড়া। এটি হয়তো মাননীয় স্পীকারের কোনো 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দোষ বা রাজনৈতিক এজেন্ডা নয়', কিন্তু এই ব্যবহার ও চর্চা স্পষ্ট করে তুলে রাষ্ট্রের জাতি-ক্ষমতার শ্রেণিচরিত্র ও বৈষম্যমূলক মনস্তত্ত্ব। এটি বঞ্চনার শর্ত আরোপ করে এবং নিপীড়নের নির্ধারণকে চূড়ান্ত ও বৈধ করে। আর এই বৈষম্য উপনিবেশিকতাকেও মূর্ত করে, কারণ কিভাবে কাউকে ডাকা হয় এবং কী নামে ডাকা হচ্ছে তা উপনিবেশিক ঐতিহাসিকতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা সচরাচর দেখি রাষ্ট্রে কোনো বাঙালি মুসলিম পুরুষের নামকে ভুলভাবে উচ্চারণ কিংবা নথিভূক্তরণের কী বিপদ! সচরাচর এক্ষেত্রে সকলেই সাবধান থাকে বা থাকতে হয় বা এই সাবধানতার নামই 'জাত্যাভিমান'। আসুন আমরা ১৯৭২ সনের ২৫ অক্টোবরের একটি গণপরিষদ বিতর্ক[৮] থেকে সেটি দেখে নিই:

জনাব ডেপুটি স্পীকার: .... এখন মানবেন্দ্র নাথ লারমা বলবেন।

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনি আমাকে যে নাম ধরে বার বার ডাকছেন, আমার নাম তা নয়। আমার নাম মানবেন্দ্র নাথ লারমা নয়। আমার নাম মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আত্মপরিচয় বয়ান পরবর্তীতে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ডিসকোর্স হয়ে ওঠে। যা জাতিরাষ্ট্রের জাত্যাভিমানকে প্রশ্ন করবার কায়দা ও প্রমাণ জারি রাখে। দেখা গেছে, গত ৪০ বছরে 'আদিবাসী আত্মপরিচয়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতি' দেশের আদিবাসী অধিকার সংগ্রামের প্রধান দাবি হয়ে ওঠেছে। যা কোনোভাবেই 'বাঙালি-বাংলাদেশী' বাইনারি দিয়ে পাঠ করা যায় না। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জিজ্ঞাসা থেকে চলমান আদিবাসী আন্দোলনের সাথে সংহতি জানিয়ে চলতি লেখাটির প্রথম পর্বখানি সংবিধান সংশোধন/পুর্নলিখনের ক্ষেত্রে দুটি প্রস্তাব রাখছে। সংবিধানের ভূমিকা অংশে উল্লেখ করা যায়, '...বাংলাদেশ একটি বহু জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, ভাষা এবং প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দেশ'। একইসাথে সংবিধানের ২৩ক ধারা সংশোধন করে লেখা যেতে পারে, '...রাষ্ট্র আদিবাসী জনগণের আত্মপরিচয়, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতিগত এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতি, মাতৃভাষা, উৎপাদনব্যবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রথাগত সামাজিক আইনের অধিকার সুরক্ষা, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন'। কৃষি-উৎপাদনব্যবস্থা, জেন্ডার, পরিবেশ, কাঠামোগত বৈষম্য, উন্নয়ন, প্রান্তিকতা প্রশ্নে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জিজ্ঞাসা গুলো আমরা এখন আলাপের দ্বিতীয় এবং শেষপর্বে হাজির করবো। এসব জিজ্ঞাসা আমাদের রাষ্ট্রের সংস্কার ও বিনির্মাণ তৎপরতাকে সক্রিয় করতে আওয়াজ তুলতে পারে।

বিনাশী উন্নয়ন কর্তৃত্বকে প্রশ্ন

সাম্প্রতিক ফেনী-বন্যার সময় ভারত-বিরোধী কিছু প্রবণতা দেখা গেল, যেখানে অভিন্ন নদীতে বাঁধ বিরোধীতার অল্পবিস্তর কিছু প্রশ্নও ছিল। ফারাক্কা ব্যারাজ থেকে টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কিংবা তিস্তার পানিবন্টন নিয়েই মূলত আমরা ট্রান্সবাউন্ডারি জাস্টিস বিষয়ে পাবলিক তৎপরতা দেখি। কিন্তু কোনো প্রবাহমান নদীর উজান কী ভাটিতে বাঁধ-ব্যারেজ বা যেকোনো ধরণের স্থাপনা নির্মাণে কোনো পরিরসর ও বর্গের অবস্থানই স্পষ্ট নয়। তারপরও ধরে নিচ্ছি বৃহৎবাঁধের বিরুদ্ধে আমাদেও অবস্থান। একইসাথে সুন্দরবনে রামপাল কয়লা বিদ্যুৎপ্রকল্প বা ফুলবাড়ি উন্মুক্ত কয়লাখনির বিরুদ্ধে আমরা লড়েছি। প্রশ্নহীনভাবে বিনাশী উন্নয়ন বাহাদুরি আমাদের বাস্তুতন্ত্র ও প্রাণসত্তার ওপর কর্তৃত্ব তৈরি করে। বৃহৎ বাঁধসহ করপোরেট খনন কী বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণ বিশেষ করে দুনিয়াজুড়ে আদিবাসীসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উদ্বাস্তু করে। কাপ্তাইড্যাম কর্তৃত্বের বিরোধীতার মাধ্যমে মানবেন্দ্র নারায়ণ

৮ প্রাগুক্ত। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

লারমাই প্রথম বিনাশী উন্নয়নকে প্রশ্ন করেন। বাংলাদেশে লাখো মানুষ আর অগণিত বুনোপ্রাণ উচ্ছেদ হয়েছিল কাপ্তাই ড্যামের কারণে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৬১ সাল থেকেই বাঁধ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৬২ সনে সংগঠিত করেন বিশাল পাহাড়ি ছাত্র সমাবেশ। ১৯৬৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তাকে আটক করে সরকার। ১৯৬৫ সালে শর্তসাপেক্ষে কারাগার থেকে মুক্তি পান। কাপ্তাই-ড্যাম পাহাড় জুড়ে যে উন্নয়ন-ট্রমা বহাল রেখেছে সেই সুরাহা আজো হয়নি। সেই উন্নয়ন-কর্তৃত্বের ন্যায়বিচার না হওয়ায়, রাষ্ট্রের উন্নয়নচিন্তা সেই হেজিমনি দ্বারাই জায়েজ হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

শ্রী লারমাঃ যে কাপ্তাই বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশের উন্নতি সাধিত হচ্ছে সেই কাপ্তাই বাঁধ এলাকার উচ্ছেদকৃত লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এখনো শেষ হয়নি। কাপ্তাই বাঁধ ঐ এলাকার মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে দিয়েছে। কাপ্তাই বাঁধ আমাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। এ বাঁধের এলাকার উচ্ছেদকৃত লোকের জীবনের কোন নিশ্চয়তা নাই। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও উপযুক্ত পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থাই সরকার করেনি।[৯]

কৃষি, জুম ও ভূমিপ্রশ্ন

লারমা বলেছিলেন, ... রাষ্ট্রীয় জীবনের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে শিক্ষা, কৃষি, দেশরক্ষা এবং তারপর হচ্ছে শিল্প।কৃষি এবং জুমের সাথে উৎপাদন ও মালিকানার সম্পর্কের রাষ্ট্রীয় আইনগত মনোযোগ স্পষ্ট করার আহবান জানান লারমা। দেশের প্রথম বাজেট আলোচনায় লারমা কৃষকের জায়গা থেকে প্রশ্ন করেন। কৃষিজমির সমবায় মালিকানা ও বন্টন এবং কৃষিজমির সংস্কার, রাজস্ব, খাজনা এবং কৃষিজমির আইন ও নীতি বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছেন লারমা। রাষ্ট্রীয় প্রজাস্বত্ব ও ভূমি অধিগ্রহণ আইনের সংশোধনের প্রস্তাব করেছিলেন তিনি। লারমা তার জীবনকালে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগণের জুমচাষের বিকাশ ও বিস্তার বিষয়ে সর্বদা তৎপর ছিলেন। ১৯৬৬ সালে দীঘিনালায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের সময়েও তিনি স্থানীয় জুমিয়াদের এ বিষয়ে সময় দিয়েছেন। দীঘিনালার ভৈরফা গ্রামে কয়েক বছর গবেষণার সুবাদে প্রবীণদের কাছ থেকে জানতে পারি খুকিবিনি, হাইরেনাচন বিনি, মনভোগবিনি, কালা খবরক, সাদা খবরক, লাল গ্যাল্লুং, সাদা গ্যাল্লুং, চিকন গ্যাল্লুং, গুড়ি গ্যাল্লুং, রাঙাপানি, চানমনি, হাল্যোজিরে, লুদিসেল, সিনেল, গজ্জ্যা, গঞ্জালি, বাচ্চুপুদি, কামারাং, ছুরির মতো দেশজ জুমধান জাত সুরক্ষায় লারমা জুমিয়াদের সচেতন করতেন।

শ্রী লারমাঃ মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদের ধানী জমির মালিকানা সমবায়ের ভিত্তিতে দেওয়া উচিত। তার ফলে কৃষক জমির মালিক হবে এবং অধিক ফসল ফলাতে যত্নবান হবে এবং তার আশা-আকাঙ্খা সত্যিকারভাবে প্রতিফলিত হবে। তাহলে দেশের দুঃখ-দুর্দশা দূর হবে[১০]।

বাংলাদেশের কৃষি ও জুমের আপন সীমানা দখল করেছে কর্তৃত্ববাদী বৈশ্বিক 'সবুজবিপ্লব এজেন্ডা'। কৃষকের ঘর বীজশূণ্য করতে গবেষণা ও বায়োপ্রসপেক্টিংয়ের নাম হরদম দেশীয় জাত গুলো ছিনতাই করা হয়েছে। একইসাথে রাষ্ট্রীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষকের গবেষণা ও অবদানকে স্বীকৃতি দেয়নি। খাগড়াছড়ির ফকুমার ত্রিপুরা, রাজশাহীর নূও মোহাম্মদ কিংবা ঝিনাইদহের হরিপদ কপালীকে কেন প্রজননবিদ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারলা না রাষ্ট্র? এটি কেবল রেজিমের সমস্যা নয়, বরং প্রবলভাবে টিকে থাকা কাঠামোগত বৈষম্য ও উপনিবেশিক মনস্তত্ত্ব। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিলের উপর তোলার লারমার জিজ্ঞাসাগুলো রাষ্ট্রের কাঠামোগত ও মনস্তাতিত্ত্বক সংস্কারের বিষয়। রাষ্ট্রীয় কৃষিগবেষণা প্রতিষ্ঠানে দেশের কৃষক ও গ্রামীণ নিম্নবর্গের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিয়ে লারমা প্রশ্ন তুলেন। লারমার সতর্কবার্ত রাষ্ট্র পাত্তা দেয়নি, দেখা যায় প্রশ্নহীনভাবে বায়োপাইরেসি ঘটেছে, গবেষণার নামে দেশ-বিদেশের গবেষকেরা দেশি জাত ও জীনবৈচিত্র্য দখল করেছে। আমরা দেখার চেষ্টা করবো এসব প্রসঙ্গে লারমা কোন ধরনের জিজ্ঞাসা হাজির করেছিলেন।

শ্রী লারমাঃ মাননীয় স্পীকার সাহেব, বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট পরিচালনার জন্য যে বোর্ড করা হয়েছে এখানে যাদের সদস্য করা হয়েছে তারা এদেশের সন্তান হলেও সত্যিকারভাবে মাটির সঙ্গে তাদের বিশেষ সম্পর্ক নেই। যে কৃষক রোদে পুড়ে, জলে ভিজে চাষাবাদ করে, নিজের জীবন নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়, আজকের এই রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট -- যেটার দ্বারা বাংলাদেশের খাদ্য-শস্যের ঘাটতি পূরণ করা হবে, সেখানে তাদের স্থান নাই। যারা সত্যিকারে চাষাবাদ করে, লাঙ্গল ধরে, যাঁরা প্রকৃত মানুষ -- এই জাতীয় সংসদে তাঁদের মত এমন প্রতিনিধি আছে কিনা জানি না। আমি একজন কৃষকের ছেলে। কৃষকের ছেলে হয়ে কৃষকের কথাই বলতে চাই। তাই আমি দেখছি যাঁরা কৃষকের অভিজ্ঞতার কথা বলবে তাঁদেরকে এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর যাঁরা 'এয়ার-কন্ডিশন' ঘরে আরাম কেদারায় বসে রিসার্চ করবে এখানে কেবল তাঁদেরই নেওয়া হয়েছে। জনাব স্পীকার সাহেব, আমার দ্বিতীয় সংশোধনী হচ্ছে A representative

৯ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক। বিষয়: বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা।। খন্ড ২ সংখ্যা ১৭। শনিবার, ২৩শে জুন, ১৯৭৩ ইং

১০ প্রাগুক্ত

nominated by the International Rice Research Institute, Los Banos, Philippines -- এটাকে বাদ দেওয়া হোক। আমি বুঝতে পারি না যে, আমাদের দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বাইরের একটি দেশের লোক কেমন করে এই বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বোর্ডের সদস্য হতে পারেন। আমাদের দেশের মাটিতে আমরা গবেষণা করব, আমরাই পরীক্ষা করব এবং তার জন্য প্রয়োজন হলে বিদেশ থেকে সাহায্য নিব, বুদ্ধি পরামর্শ নিব। সেই জন্য আমি এটাকে সম্পুর্নরূপে 'ডিলিট' করতে বলছি[১১]।

নিম্নবর্গ ও প্রান্তিকতা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বারবার দেশের প্রান্তজনের আয়নায় রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করেছেন, প্রস্তাব তুলে ধরেছেন। হরিজন, বেদে, ভিখারি, ভবঘুরে, কারখানার মজুর, রিকশাচালক, মেথর, যৌনকর্মী সবার অধিকারের কথা জোরালোভাবে উত্থাপন করেছেন। ১৯৭৪ সনের গণপরিষদে জাতীয় বাজেট বক্তৃতার বিবরণী পাঠ করা যাক। সেসময় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাই দেশের প্রথম জনপ্রতিনিধি যিনি বেদেসহ সকল বঞ্চিত মানুষের কথা সংসদে উত্থাপন করেছিলেন এবং তাদের উন্নয়নে বিশেষ বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করেছিলেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সেদিনের প্রস্তাব জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়নি, তখনকার কোনো সাংসদই তাকে সমর্থন করেননি, তিরস্কার করেছিলেন। দীর্ঘসময় পরে বেদে, হিজড়া, দলিতদের জন্য বিশেষ বাজেট ও সুরক্ষাবেষ্টনী প্রকল্প বরাদ্দ দিতে রাষ্ট্র বাধ্য হয়েছে। লারমা জাতীয় সংসদে 'ভবঘুরেদের' বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করেন। তিনি বাংলাদেশে ভবঘুরেদের পরিসংখ্যান জানতে চান এবং ভবঘুরেদের সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য কোনো ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কীনা সেটিও জানতে চান।[১২]

১৯৭৪ সালের ২৮ জুন। জাতীয় বাজেট আলোচনায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বেদে জনগোষ্ঠীর অধিকারের কথা তুলেন। সেসময় তিনি বলেছিলেন, ...মাননীয় ডেপুটি স্পীকার সাহেব, যারা যুগ যুগ ধরে, আবহমান কাল ধরে সমাজে অবহেলিত, সেই বেদের দল, যাদের ঘর-বাড়ী নেই, নৌকার উপর যারা জীবনযাপন করে, এদের প্রতি সরকারের কোন নজর নেই। বেদের মত যাঁরা মেথর, তাদেরও আজকে কোন অস্তিত্ব নাই। তারা মানুষের মত স্বাধীনভাবে বসবাস করার কি কোনদিন স্বীকৃতি পাবে না? আজকে যারা সমাজে অবহেলিত, তাদের স্থান সমাজে কি আর কোনদিন ফিরে আসবে না[১৩]?

পুঁজিবাদী কর্তৃত্ব ও মেহনতি মজদুর

বৈশ্বিক পুঁজিবাদ, অর্থনৈতিক ধারা এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শ্রেণিচরিত্র সম্পর্কে লারমার ভাষ্য জানান দেয় তিনি মেহনতি মজদুরের জন্য সাম্য ও ন্যায্য সমাজ চেয়েছিলেন। মজদুর জনগণের ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহসী উচ্চারণ করেছেন বারবার।

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি বলতে চাই যে, মানুষের কথা এই সংবিধানে সংযোজিত করতে হবে। যদি মানুষের কথা এই সংবিধানে না থাকে, তাহলে এই সংবিধান দিয়ে কি হবে[১৪]?

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার, আজকে এখানে দাঁড়িয়ে বলতে হচ্ছে, প্রশ্ন করতে হচ্ছে যে, এটা কাদের সংবিধান? যদি জনগণের সংবিধান না হয়, তাহলে আমরা দেশকে কেমন করে গড়ে তুলব, দেশের মানুষকে কেমন করে ভবিষ্যতে সুখী জীবনের নির্ভরতা দান করব[১৫]?

শ্রী লারমা: জনাব স্পীকার সাহেব, সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিগুলি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। আমরা এমন সংবিধান চাই, যে সংবিধান আমাদের ভবিষ্যৎ বংশদের জন্য একটা পবিত্র দলিল হয়ে থাকবে। সেরকম সংবিধানই আমরা চাই। আজকে মানুষের মনে যে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে, আমরা যদি সেই সন্দেহের অবসান না করি, নিরসন না করি, তাহলে আর কে করবে? আমাদের পর যারা আসবেন, তাদেরও সেই একই করুণ অবস্থা হবে– যেমন হয়েছে পূর্ববর্তীদের। সেই করুণ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটুক, আমরা তা চাই না।[১৬]

শ্রী লারমা : জনাব স্পীকার সাহেব, আমাদের মনের আকাংখা ও অভিব্যক্তি প্রকাশের শেষ পর্যায়ে এসেছি। আজকের এই শেষ দিনে আমাদের যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি নর-নারীর যে মনের কথা, যে মনের অভিব্যক্তি, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার কথা এই মহান গণপরিষদে এক পবিত্র দলিলে আমরা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি -- যে দলিলে থাকে মানুষের চলার পথের ইঙ্গিত, মানুষের এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত, মানব সভ্যতা গড়ে তোলার

১১ দেখুন: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক। বিষয়: BANGLADESH RICE RESEARCH INSTITUTE BILL, 1973, খন্ড ২ সংখ্যা ২১। বৃহস্পতিবার, ২৮শে জুন, ১৯৭৩ ইং

১২ দেখুন: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতক, বিষয়-ভবঘুরে, খন্ড ২, সংখ্যা-৩০, ১৩ জুলাই ১৯৭৪

১৩ দেখুন: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক। বিষয়: The Finance Bill, ১৯৭৪ খন্ড ২ সংখ্যা ১৮ শুক্রবার , ২৮শে জুন , ১৯৭৪

১৪ দেখুন: বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনা। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

১৫ প্রাগুক্ত

১৬ বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনা। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

ইঙ্গিত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সংবিধানের আলোচনায় আমি যেসব প্রশ্ন তুলেছিলাম, সেইসব প্রশ্ন এখানে গৃহীত না হলেও আমি বলেছিলাম অধিকার হারা মানুষের কথা, বঞ্চিত মানুষের কথা, যাঁরা কল-কারখানায় চাকুরী করে, সেই শ্রমিক ভাইদের কথা, যাঁরা দিন রাত রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, শক্ত মাটি চাষে সোনার ফসল ফলায়, সেই চাষী ভাইদের কথা। যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করে, আমি তাঁদের কথা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম সেই ভিখারীদের কথা, আজ এই সংবিধান যাদের রক্তে এল, তাঁদের কথা যেন ভুলে না যায়[১৭]।

নারীমুক্তি

সংবিধানে 'নারীর জন্য স্পষ্ট কোনো অধিকারের জায়গা নাই' এমন একটি বাহাস তুলেছিলেন লারমা। তিনি উত্থাপন করেছিলেন, ... তারপর আমি বলব, সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনদের কথা সংবিধানে নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে। কারণ, তারাও সমাজের অর্ধেক অংশ।[১৮]

পরিবেশপ্রশ্ন ও প্রকৃতিপ্রেম

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তার সাংগঠনিক অনেক কাজে কর্মী ও প্রতিনিধিদের নানাভাবে পরিবেশপ্রশ্নে দায়বদ্ধ হতে তিনি বাধ্য করেছেন, তাদের ভেতর পরিবেশ সুরক্ষার চর্চা গড়ে তুলেছেন। একটা পাহাড়, বনভূমি বা প্রাকৃতি বাস্তুতন্ত্র থেকে কতখানি প্রাকৃতিক সম্পদ কীভাবে আহরণ করা জরুরি এই পরিবেশগত নীতিশিক্ষা তিনি চালু করেছিলেন নিজের সংগঠনে। ১৯৬৯-১৯৭১ এর সময় রাঙ্গামাটির কন্ট্রাক্টর পাড়ার শেষ মাথায় একটা বাঁশের বেড়া, শণের ছানি অতি সাধারন মাটির ঘর ছিল। এই ঘরেই তিনি সপরিবারে বাস করতেন। ঘরের মেঝেতে পাটি বিছিয়ে হাসি মুখে তিনি সকলকে আতিথেয়তা দিতেন। তার ঘরে কোন কাঠের সোফা বা কাঠের চেয়ার ছিল না। অতিথিদেরকে বাজ-দাবা(বাঁশের হুক্কা) আর পান সুপারি দিয়ে আপ্যায়ন করা হত।[১৯]

লারমার বয়ান ও জেন-জির গ্রাফিতি

আমরা আজকের আলাপের শেষপ্রান্তে চলে এসেছি। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জরুরি জিজ্ঞাসা গুলোর ভেতর দিয়ে এটি স্পষ্ট যে, পিনন বা হাদি বস্ত্র বুনতে গেলে প্রথমত আমাদের ইনক্লুসিভ আলাম দরকার। আলাম হলো চাকমা বস্ত্রবয়নের ক্ষেত্রে জনআকাংখার মৌলিক ব্যাকরণ ও সাংস্কৃতিক চুক্তি। লারমার সংবিধান দর্শন মোতাবেক কোনো ইনক্লুসিভ আলাম আমাদের পাড় ও জমিনের বুনন ও নকশা বিস্তারে রূপরেখা দেখাবে। লারমা বারবার স্পষ্ট করেছেন এই আলামে সমাজের সর্বস্তরের জনআকাংখার প্রতিফলন থাকতে হবে। সংবিধান হবে সকলের দলিল। গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে বিস্তারের ভেতর দিয়ে সামাজিক বৈচিত্র্য ও বহুত্ববাদ চেয়েছেন লারমা। বহুদিন বাদে জুলাই অভ্যুত্থানের পর দেশব্যাপি জেন-জি বা নতুন প্রজন্ম বহুপ্রশ্ন ও আকাংখার গ্রাফিতি এঁকেছে। 'হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও আদিবাসী, আমরা সবাই বাংলাদেশ'। জুলাই অভ্যুত্থান এই ইনক্লুশনের জরুরত দারুণভাবে সামনে এনেছে। নতুন প্রজন্মের গ্রাফিতি পাঠ করতে হবে। নতুন প্রজন্মের গ্রাফিতিতে আমরা লারমার বয়ানের চিত্রভাষ্য দেখতে পাই। আর এখানেই লারমা এখনো আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক, কারণ লারমার জিজ্ঞাসাগুলো জরুরি ছিল। সেইসব অমীমাংসিত জিজ্ঞাসাই জেন-জির আওয়াজে জুলাই অভ্যুত্থানে গ্রাফিতি হয়ে ওঠেছে। সংবিধান ও রাষ্ট্র সংস্কার কিংবা রূপান্তরে লারমা ও নতুন প্রজন্মের গ্রাফিতিকে পাঠ করা জরুরি। আমরা আশা করবো রাষ্ট্র সংস্কার ও তৎপরতার ভেতর লারমা ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান উত্থাপিত ইনক্লুসনের প্রাথমিক বিষয়গুলো অন্ততপক্ষে রাষ্ট্র এড়িয়ে যাবে না।

লেখক ও গবেষক। ই-মেইল: *animistbangla@gmail.com*

১৭ বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: সংবিধান-বিল (গৃহীত)। খন্ড ২ সংখ্যা ১৬। শনিবার, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭২ ইং

১৮ দেখুন: বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনা। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

১৯ দেখুন: চাকমা, বিজয় কেতন। স্মরণীয় বরণীয় মহান নেতার আদর্শ। এই প্রবন্ধটি নেয়া হয়েছে ১০ নভেম্বর ১৯৮৩ স্মরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা থেকে। রাঙ্গামাটি, বাংলাদেশ। ২০০২, পৃ.১৬

বাংলাদেশে সংবিধান সংস্কারঃ প্রসঙ্গ আদিবাসী জনগণের জন্য ন্যায়বিচার, আত্ম-পরিচয় এবং রাজনৈতিক অধিকার

॥ ড. খায়রুল চৌধুরী ॥

গত ৫ আগস্ট ২০২৪ গণ আন্দোলনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের এক দৃশমান মতাদর্শিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছে। যদিও আন্দোলনকারীরা আবেগতাড়িতভাবে এই পরিবর্তণকে 'বিপ্লব', ও 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' অভিধায় উৎযাপন করেছে, কিন্তু প্রশ্ন হল কেন এই পরিবর্তন? এই আন্দোলন কি স্বতঃস্ফূর্ত 'বিপ্লব', নাকি পরিকল্পিত 'পরিবর্তন' মাত্র, অথবা ভূ-রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত? ছাত্রনেতাদের একক কৃতিত্ব-কর্তৃত্ব এবং আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিভিন্ন মত ও বির্তক চলমান আছে। আমার মতে এই বিতর্কের মীমাংসা হওয়া জরুরি, কিন্তু এটি একটি সময় সাপেক্ষ বিষয়। আপাতভাবে, আমাদের এটা স্বীকার করতে হবে যে, বিগত ১৬ বৎসর ধরে চলমান আওয়ামী লীগ সরকারের আর্থিক দুর্নীতি, স্বৈরাচারী প্রবণতা এবং নির্বাচনী কারচুপির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলসহ সরকার বিরোধী দলসমূহের সরকার বিরোধী আন্দোলনের কার্যত ব্যর্থতার সাতকাহন দলিল। পক্ষান্তরে, অভয় প্রজন্মের (জেনারেশন জেড, ১৯৯৭-২০১২) ছাত্রদের নেতৃত্বে জুলাই-আগস্ট আন্দোলন আওয়মী লীগ সরকারের পতনে প্রধান প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে।

জুলাই-আগস্ট ছাত্র আন্দোলন লক্ষণীয় দিক হলো: প্রথমত: এই আন্দোলন বিভিন্ন বামপন্থী, ডানপন্থী এবং ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহ ও জনগণের বৃহত্তর অংশকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক 'বৈষম্যহীন সমাজ' ও গণতন্ত্রের জন্য একত্রিত করেছে, বিশেষভাবে, প্রাইভেট ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলা, ইংরেজি, ও ধর্মীয় মাধ্যমের স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যকার প্রচলিত শ্রেণি ও মতাদর্শের পার্থক্যকে অতিক্রম করেছে। দ্বিতীয়ত: স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘকাল ধরে প্রভাবিত করে আসা বাঙালি/বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সামরিক-রাজনৈতিক বন্দোবস্তকে স্বৈরতান্ত্রিক-ফ্যাসিবাদী বিচ্যুতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তৃতীয়ত: কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এই আন্দোলন জাতি, জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রশ্নে একটি অ-উপনিবেশিক, গণতান্ত্রিক ও 'বৈষম্যহীন সমাজের' লক্ষ্যে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তকে অপরিহার্য করে তুলেছে।

পরিবর্তিত এই প্রেক্ষাপটে ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে আন্দোলনকারী ছাত্রনেতৃবৃন্দ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও এনজিও প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেছে। বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্রঋণের অধিকার প্রসারে অগ্রণী কাজের জন্য পরিচিত, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ড. ইউনুস একজন দল-নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। দায়িত্ব গ্রহণের পরে তিনি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রসাশনিক ও সাংবিধানিক সংস্কার এবং নতুন নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে গত ১১ সেপ্টেম্বর তাঁর সরকার সংবিধান, নির্বাচন, বিচার বিভাগ, পুলিশ, জন-প্রশাসন, ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে এবং গত ১৭ সেপ্টেম্বর গণমাধ্যম, নারী, শ্রমিক অধিকার, ও স্বাস্থ্য বিষয়ে আরো চারটি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। উদ্ভূত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর সরকার বাংলাদেশের বিদ্যমান ইতিহাস, রাজনীতি, মতাদর্শ ও বিভিন্ন শ্রেণি-গোষ্ঠীর বিভাজনগুলির সেতুবন্ধন করতে ও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনে কতটুকু সক্ষম হবেন তা ভবিষ্যত অনুমানের বিষয়। তবে বাংলাদেশ যখন এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, এবং সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের সুযোগ তৈরি হয়েছে, বাংলাদেশের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি, যারা বাংলাদেশ মূল সংবিধানে স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে আত্ম-পরিচয়, স্ব-শাসন, নাগরিক ও মানবাধিকরের জন্য সামরিক-বৈসামরিক বাঙালি আধিপত্যের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সংগ্রাম করছে। এই প্রবন্ধে আমি বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামো পর্যালোচনা করে, প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংস্কারের প্রস্তাব আলোচনা করবো এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজে সমসাময়িক রাজনৈতিক তত্ত্বগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে আদিবাসী জনগণের অধিকারগুলি উত্থাপন করার চেষ্টা করবো। আমার প্রত্যাশা আমার এই আলোচনা একটি আরও বহুমাত্রিক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য মঞ্চ তৈরি করবে এবং আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায় ও জাতিসমূহের অধিকারকে স্বীকৃতি ও সুরক্ষিত করার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরবে।

বাংলাদেশের সংবিধানের বিশ্লেষণ

একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্টার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ৪ নভেম্বর ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে সংবিধানটি সমস্ত নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তবে এই সংবিধানের অন্যতম সীমাবদ্ধতা ও বিচ্যুতি ছিল: প্রথমত, বাংলাদেশকে একটি একক কেন্দ্রিভুত রাষ্ট্র ঘোষণাড়্য়া দেশে সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে এবং গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে রাষ্ট্র ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশের পথকে রুদ্ধ করেছে। দ্বিতীয়ত, এটি 'বাঙালি' জাতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, যা সংবিধান সভার সদস্য এম এন লারমার তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঐতিহাসিকভাবে বসবাসরত অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আদিবাসী জাতিসমূহের আত্ম-পরিচয় ও অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছিলো। এক অর্থে, আদিবাসীদের সাংবিধানিক অস্বীকৃতি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের একটি সশস্ত্র সংগ্রামে (১৯৭৩-১৯৯৭) উদ্বুদ্ধ করেছে। দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আদিবাসী জাতিসমূহ, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে একটি অঙ্গ হিসেবে নিজেদের স্বীকৃতি ও অধিকার লাভের জন্য বাংলাদেশের বাঙালীদের উপনিবেশ বিরোধী ঐতিহাসিক সংগ্রাম থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সকল সংগ্রামে সবসময়ই সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করেছে। ১৯৭৩ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সংবিধানের সংশোধনগুলি যদিও সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার ও সমাজতান্ত্রিক নীতির পরিবর্তনসহ রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরিক্ষা করেছে, বাঙালি আত্ম-পরিচয়ের পরিবর্তে ভু-খন্ড কেন্দ্রিক বাংলাদেশী জাতীয় পরিচয়ের উপর জোর দিয়েছিল, কার্যত সাংবিধানিক সংশোধনগুলি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের পরিবর্তে দেশকে ইসলামিক মতাদর্শ ও পশ্চিমা নয়া-উদারতাবাদের সমন্বয়ে একটি বৈষম্যমূলক স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে পরিণত করেছে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আদিবাসী জাতিসমূহ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও জনসংখ্যার দিক থেকে প্রান্তিকরণ করেছে।

আদিবাসী জাতিসমূহের স্বার্থ বিবেচনায় ২০১১ সালে গৃহীত সংবিধানের ১৫তম সংশোধনী একটি বিরোধপূর্ণ কিন্তু আংশিকভাবে ইতিবাচক ঘটনা। যদিও এটি ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করেছে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আদিবাসী জাতিসমূহকে উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু এটি আদিবাসী জনগণের বিশেষ প্রয়োজন এবং অধিকারগুলির যথাযথভাবে মোকাবেলা করেনি। ভিন্ন অর্থে ১৫তম সংশোধনী ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদকে পুনঃস্থাপন করেছে যা উপনিবেশিক ভাষ্যে অবাঙালি পরিচয়গুলিকে মার্জিত করেছে মাত্র। আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির অনন্য সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধানের অভাব শুধু একটি বিচ্ছিন্ন সুযোগকে প্রতিফলিত করেছে যা সাংবিধানিক নীতিগুলিকে একটি বৈচিত্র্যময় সমাজের বাস্তবতার সাথে মেলানো হয়নি। সঙ্গত কারণে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আদিবাসী জাতিসমূহ এখনও অরক্ষিত বোধ করেন এবং ন্যায় ও সমতার জন্য কাঠামোগত বাধার মুখোমুখি হন।

সংবিধানগত কাঠামোর এই পরস্পর বিরোধিতা ও সংবিধানে আদিবাসী পরিচয়ের স্পষ্ট স্বীকৃতির অভাব, তাদের অস্পষ্ট আত্ম-পরিচয়ে গোষ্ঠীভুক্ত করে। উপরন্তু, আদিবাসী জাতিসমূহের প্রথাগত ও ব্যক্তিগত জমির অধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলি বিতর্কিত রয়ে গেছে, আদিবাসী জাতি ও সম্প্রদায়গুলি প্রায়শই রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন প্রকল্পে জমি দখল করার কারণে বাস্তুচ্যুত ও দেশান্তরি হতে বাধ্য হচ্ছে। এছাড়াও, আদিবাসী জনগণের জন্য জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব আজও ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত, যেহেতু জনসংখ্যা ভিত্তিক নির্বাচনী আসন ব্যবস্থা প্রায়ই তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রান্তিকীকরণকে চিরন্তন করে। এই সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করা ও একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের জন্য বিদ্যমান সংবিধানের সংস্কার অত্যাবশ্যক, যা সত্যিই সমস্ত নাগরিকের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং সুরক্ষিত করে, বিশেষ করে ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চিত আদিবাসী জাতি ও সম্প্রদায়গুলির।

জাতি, জাতীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগণ: সামাজিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও আন্তর্জাতিক আইন

বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন গোষ্ঠীর অধিকার এবং স্বীকৃতি পর্যালোচনার জন্য জাতি, জাতীয় সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝা অপরিহার্য। এককথায় বলতে গেলে জাতি, জাতীয় সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী জাতি ও জনগোষ্ঠীসমূহ আধুনিকতার ফসল এবং একে অন্যের পরিপূরক। কেননা জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উত্থানের সঙ্গে জড়িত, যা প্রায়শই 'ওয়েস্টফেলিয়া ব্যবস্থা' নামে পরিচিত। 'ওয়েস্টফেলিয়া ব্যবস্থা' হলো ১৭শ শতকের ইউরোপে স্পেন বনাম ডাচ প্রজাতন্ত্র এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যকার দীর্ঘকালীন যুদ্ধের নিষ্পত্তিতে অনেকগুলি শান্তি চুক্তি যার ফলশ্রুতিতে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত ও কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্যসমূহ একে অপরের সার্বভৌমত্ব এবং ভূখন্ডকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি

দেয়। ওয়েস্টফেলিয়া ব্যবস্থার প্রাথমিক অবদান সত্ত্বেও, এই ব্যবস্থা কিভাবে একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে উঠেছে, এ প্রশ্নে সামাজিক বিজ্ঞানের সর্বজনগ্রাহ্য পন্ডিতেরা শিল্প-ভিত্তিক সমাজের উদ্ভব, ছাপাখানা নির্ভর সংবাদপত্র, সাহিত্য ও গণযোগাযোগের মাধ্যমে বিকশিত জাতীয় কল্পনা, অথবা রাজনৈতিক অর্থনীতিতে কেন্দ্র করে নির্বাচিত নতুন প্রথার ধারণাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যকথায়, জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র একটি শিল্প-পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজের নতুন বন্দোবস্ত যা পশ্চিমা সমাজে বিকশিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বি-উপবিশায়ন এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ সনদের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচীর মাধ্যমে একটি সর্বজনীন বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে গড়ে উঠেছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর লীগ অফ নেশনস এর জাতীয় সংখ্যালঘু প্রকল্পের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার সময়ে প্রতিষ্ঠাতারা জাতি-রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতীয় সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী জাতিসমূহের উত্থাপিত অধিকারের প্রশ্নকে অনেকাংশে উপেক্ষা করেছেন এবং জাতিরাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও জাতীয় ঐক্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পশ্চিমা সমাজের অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক ঔপনিবেশক স্বার্থও এই বঞ্চনার একটি অন্যতম কারণ। ফলে তাঁরা জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের ব্যক্তিগত অধিকারের উপর জোর দিয়েছিলেন যা ১৯৪৮ সালের সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার মাধ্যমে আরো জোরালো হয়েছিল।

সাম্প্রতিককালে, আদিবাসী সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশ জাতিসংঘের কাঠামোতে জাতীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার বিষয়ে এক বৃহত্তর পরিবর্তনের অংশ। এর সূচনা হয়েছিলো ১৯৫৭ সালের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কনভেনশন ১০৭ এর মাধ্যমে। যদিও এই আইনটি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেন্দ্রিক বিবর্তনবাদ, বর্ণবাদ ও পিতৃতন্ত্রের ধারণা ও মতাদর্শে প্রভাবিত, তথাপি এটি আদিবাসীদেরকে বঞ্চনা ও নিপীড়ন থেকে রক্ষার লক্ষ্যে তাদেরকে জোরপূর্বক আত্তীকরণ ও উদ্বাস্তুকরণে রাষ্ট্রকে নিরুৎসাহিত করে এবং তাদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষার অগ্রাধিকারসহ ভূমির অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। অদ্যাবধি বাংলাদেশসহ ২৭টি দেশ আইএলও কনভেনশন ১০৭ অনুসমর্থণ করেছেন এবং ১৮টি দেশে এই আইন বলবৎ আছে।

যেহেতু বিশ্বব্যাপী আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি তাদেরকে স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী হিসাবে অধিকারের স্বীকৃতি এবং সুরক্ষার দাবি করে আসছিল, তাই ১০৭ কনভেনশনটি ১৯৮৮ এবং ১৯৮৯ সালে সংশোধন করে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা 'আদিবাসী ও উপজাতীয় জনগণের কনভেনশন, ১৯৮৯' (আইএলও কনভেনশন ১৬৯) প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়। এই নতুন কনভেনশনে জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে আদিবাসীদের স্বনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতিসহ আদিবাসীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অধিকারগুলির বিষয়ে জাতীয় সরকারগুলির জন্য মান নির্ধারণ করে, যার মধ্যে একটি হলো আদিবাসীদের ভূমি-অধিকার। অদ্যাবধি নেপালসহ মাত্র ২৩টি দেশ কনভেনশন ১৬৯ অনুসমর্থন করেছে যাদের মধ্যে অধিকাংশই ল্যাটিন আমেরিকার দেশ। একই সময়ে জাতিসংঘ আদিবাসীদের সুরক্ষায় একটি সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে এবং ২০০৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৪৪ টি দেশের সমর্থনে 'জাতিসংঘের আদিবাসী জনগণের অধিকারের ঘোষণাপত্র' (UNDRIP) অনুমোদন করে। যদিও এই আদিবাসী ঘোষনাপত্রটি জাতীয় সরকারগুলির জন্য আন্তর্জাতিক আইনের মতো কোন আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না, তবে এটি মৌলিক মূল্যবোধের একটি অভিব্যক্তি যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ রাষ্ট্রই সমর্থন করে এবং যা ইতোমধ্যে আদিবাসীদের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের উন্নয়নে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

প্রসঙ্গত, আদিবাসী সম্পর্কিত জাতিসংঘের এই সকল আইন ও ঘোষণা ছাড়াও, ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি' (covenant) গৃহীত হয় (ICCPR), এই চুক্তিটি ১৯৭৬ সালে কার্যকর হয়, এবং ইতোমধ্যে ১৬৭টি রাষ্ট্র দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। এই চুক্তি শুধুমাত্র 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে' (UDHR) অন্তর্ভুক্ত সর্বজনীন নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং স্বাধীনতাকে বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত করেছে তা নয়, একইসাথে এই চুক্তি জাতীয় সংখ্যালঘুদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের স্বাধীনতার আইনগত স্বীকৃতিও প্রদান করেছে।

উপর্যুক্ত জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আইন ও ঘোষণার আলোকে বিবেচনা করলে এটা সুস্পষ্ট যে, জাতি, জাতীয় সংখ্যালঘু, ও আদিবাসী ধারণাসমূহ কেবল একক কোন দেশ অথবা জাতির ইতিহাস, রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রশ্ন নয়, বরং ধারণাগুলি বৈশ্বিক ইতিহাস, আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র, ও রাজনীতির সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত এবং আন্তর্জাতিক আইনের অংশ। সঙ্গত কারণে, মতপার্থক্য সত্ত্বেও, জাতি, জাতীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী ধারণাসমূহের পার্থক্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও সর্বজনীন। অন্যকথায়, আদিবাসীরা হলো জাতীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী যারা আধুনিক

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই তাদের অঞ্চলে বিদ্যমান। এই গোষ্ঠীগুলি তাদের জাতি-রাষ্ট্র ও জাতীয় সংস্কৃতি মেলাবন্ধনে না মিলে, পূর্বপুরুষদের ভূমি, ভাষা এবং ঐতিহ্যের আলোকে প্রথাগতভাবে স্ব-শাসিত অথবা প্রথা দ্বারা শাসিত। বিপরীতে, জাতীয় সংখ্যালঘুরা জাতি, ভাষা বা ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত এমন একটি গোষ্ঠী যারা জাতীয় রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির অংশ, কিন্তু বিশেষ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নাগরিক অধিকার দাবি করে। জাতিসংঘের আদিবাসী জনগণের অধিকারের ঘোষণাপত্র (UNDRIP) আদিবাসী জনগণের স্বতন্ত্র পরিচয়, সংস্কৃতি, এবং শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখার অধিকারের উপর গুরুত্বারোপ করে, পাশাপাশি তাদের ভূমি এবং সম্পদের প্রতি স্বাভাবিক অধিকারও স্বীকার করে।

আন্তর্জাতিক কাঠামোর উপস্থিতি সত্ত্বেও, বাংলাদেশে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির জন্য এই আইনগুলির এবং জাতীয় নীতির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিচ্ছিন্নতা রয়ে গেছে। এর নানাবিধ কারণ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো নীতি নির্ধারকদের মধ্যে আদিবাসী অধিকারকে জাতীয় এজেন্ডায় অগ্রাধিকার দেওয়ার রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব, যা প্রায়শই বাঙালি জাতীয়তার আধিপত্যবাদী মতাদর্শ ও মনঃস্তত্ব দ্বারা প্রভাবিত। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘু পরিচয়সমূহকে সমন্বয় বা আধিপত্যের দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে দেখার প্রবণতাও এই বিচ্ছিন্নতার একটি কারণ। পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের নামমাত্র প্রতিনিধিত্ব এবং তাদের অধিকার সুরক্ষার জন্য অপর্যাপ্ত আইনী কাঠামো তাদের অগ্রগতিকে আরও বাধাগ্রস্ত করে। যদিও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সকল নাগরিকের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়, তবে এটি সুনির্দিষ্টভাবে আদিবাসী জনগণের সুরক্ষা প্রদান করতে ব্যর্থ, যা তাদের ভূমি অধিকার এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ক্রমাগত অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, দারিদ্র্য এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সীমিত অ্যাক্সেসের মতো সামাজিক-অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলি আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির প্রান্তিকীকরণকে বাড়িয়ে তোলে, আন্তর্জাতিক মানগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাকে জটিল করে। এ কারণে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন যা সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রচার এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অর্থপূর্ণ সংলাপে অংশগ্রহণের পথকে নিশ্চিত করে এবং আন্তর্জাতিক আইনগুলিকে বাস্তবতার সুরক্ষায় রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে।

জন রল্‌স (John Rawls) এবং উইল কিমলিকারের (Will Kymlicka) মতো পন্ডিতেরা দাবি করেন সত্যিকার গণতন্ত্র অর্জনের জন্য একটি সমাজকে ন্যায়সঙ্গতভাবে আদিবাসীসহ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তাদেরকে অভিযোজিত করতে হবে। রল্‌স ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে সততা এবং সমতার উপর জোর দেন, যা প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলিকে সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় পূর্ণ অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। কিমলিকা রল্‌সের বক্তব্যকে আরো বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং দাবি করেন যে, সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য আদিবাসী জনগণের অধিকারসহ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অধিকারগুলির স্বীকৃতি অপরিহার্য যা একটি জাতির মধ্যে বিভিন্ন পরিচয়কে সম্মানিত করা নিশ্চিত করে। একই প্রসঙ্গে জেমস আনায়া (James Anaya) দাবি করেন যে, আদিবাসী অধিকার মানবাধিকার এবং যে কোনো সমাজের গণতান্ত্রিক পরিসরের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। অমর্ত্য সেনের (Amartya Sen) সক্ষমতা দৃষ্টিভঙ্গি সব মানুষের, যার মধ্যে আদিবাসী জনগণও অন্তর্ভুক্ত, এমন জীবন যাপন করার গুরুত্বকে তুলে ধরে, যা তারা মূল্যবান মনে করে, বৈচিত্র্য এবং সমতা প্রচারের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনের প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষভাবে তুলে ধরে। সুতরাং আমার মতে, আদিবাসী অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া কেবল একটি ন্যায়ের বিষয়ই নয় বরং গণতন্ত্রের একটি মৌলিক উপাদান, কারণ এটি সকল নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব করে এবং অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করে, একটি আরও ন্যায়সংগত এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজের উন্নতি ঘটায়।

সংবিধান সংশোধনের জন্য সুপারিশসমূহ

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য হল শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক মানবাধিকার ও ন্যায় নিশ্চিত করা, তাই সংবিধান সংস্কারে আদিবাসী জনগণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয় ও অধিকারগুলো স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি। এ প্রসঙ্গে আমার সুপারিশসমূহ হল নিম্নে তুলে ধরা হল; আমার মতে এই সুপারিশসমূহ সংবিধানের প্রস্তাবনায় বর্ণিত মূলনীতির আলোকে বাংলাদেশকে তার গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি পূরণের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

(ক) আদিবাসী জনগণের স্বীকৃতি

যদিও সংবিধানের ২৩(ক) নং অনুচ্ছেদ আদিবাসী জনগণকে গোত্র, জাতি এবং ছোট নৃগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তবুও ন্যায় ও সমতার জন্য বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসী জনগণকে জাতীয় সংখ্যালঘু থেকে পৃথক স্বতন্ত্র 'আদিবাসী' গোষ্ঠী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া অপরিহার্য। এই স্বীকৃতির আইনগত কাঠামোটিকে শক্তিশালী করার জন্য ৬(২) নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করা উচিত, কেননা এই অনুচ্ছেদ অন্যান্য জাতি ও গোষ্ঠীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং ২৩(ক) এর সাথে সাংঘর্ষিক। উপরন্ত, আদিবাসী সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট প্রয়োজন এবং আকাঙ্ক্ষাকে বিবেচনায় নিয়ে সংবিধান

অথবা বিশেষ আইনে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর নির্দিষ্ট প্রথাগত অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে, যা বৈচিত্র্যকে সম্মান দেখিয়ে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় পরিচয় গড়ে তুলবে।

(খ) রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব

আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোকে জাতীয় সরকার ও শাসন কাঠামোতে যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সংবিধান সংস্কারের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে আদিবাসী জনগণের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। একইসাথে, অনুচ্ছেদ ৫৯(৩) এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আদিবাসী সম্প্রদায়ের স্ব-শাসনের জন্য বিশেষ ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তৈরি করা যেতে পারে। এটি নীতি-নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে এবং শাসনে তাদের অংশগ্রহণ বাড়াবে। তদুপরি, এই বিশেষ ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর স্বার্থ রক্ষার জন্য আইনগত সুরক্ষা এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

(গ) ভূমির অধিকার ও স্বায়ত্তশাসন

আদিবাসী জনগণের আত্ম-পরিচয় নির্ধারণের জন্য ভূমির অধিকার ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে অবকাঠামো গঠন করা অপরিহার্য। কিমলিকা ও রল্সের তত্ত্বের ভিত্তিতে, সম্পদের বণ্টনে ন্যায়ের জন্য আদিবাসীদের পূর্বপুরুষের ভূমির দাবি স্বীকার করা প্রয়োজন। আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোকে তাদের ভূখন্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ দেওয়ার মাধ্যমে, রাষ্ট্র ঐতিহাসিক ভুলের সমাধান করবে এবং এই গোষ্ঠীগুলোকে তাদের সম্পদের টেকসইভাবে ব্যবস্থাপনার সুযোগ দেবে। এই স্বায়ত্তশাসন শুধুমাত্র তাদের সংস্কৃতি এবং জীবিকা রক্ষার সক্ষমতা বাড়াবে তা নয়, বরং দেশের মধ্যে শক্তি ও সম্পদের ন্যায্য বণ্টনে অবদান রাখবে।

(ঘ) সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত সুরক্ষা

আদিবাসী জনগণের অনন্য পরিচয় রক্ষার জন্য সাংবিধানিক সংস্কারগুলোতে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সুরক্ষার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এক্ষেত্রে দ্বিভাষিক শিক্ষা প্রচার, বিশেষ সাংস্কৃতিক উদ্যোগের সমর্থন এবং জাতীয় পাঠ্যক্রমে আদিবাসী জ্ঞানের সংযোজন অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই ধরনের পদক্ষেপ শুধু আদিবাসী ঐতিহ্যকে সংরক্ষণই করবে না, বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়া বাড়াতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশে একটি সংহত বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে বিদ্যমান সংবিধানে রাষ্ট্রের নীতি হিসাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে (অনুচ্ছেদ ৯) সংশোধন করে আদিবাসী জনগণের সাংস্কৃতিক অধিকারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যা একদিকে যেমন দেশের বৈচিত্র্যকে উদযাপন করবে, অন্যদিকে তেমনি আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপকে উৎসাহিত করবে।

(ঙ) আন্তর্জাতিক আইন অন্তর্ভুক্তি

সাংবিধানিক সংস্কারগুলোকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মান, যেমন জাতিসংঘের আদিবাসী জনগণের অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র (UNDRIP) এবং আইএলও কনভেনশনগুলির সঙ্গে একত্রিত করা গুরুত্বপূর্ণ। আদিবাসী জনগণের অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রের আলোকে, বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় আইনে আন্তর্জাতিক আইনসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে। এই সমন্বয় আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর জন্য আইনগত সুরক্ষার পাশাপাশি সংবিধানে ঘোষিত সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিকে জোরদার করবে। ফলে জাতীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের জন্য 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি'র (ICCPR) আইনগত বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি এই আন্তর্জাতিক মানগুলোর সফল বাস্তবায়নের জন্য আদিবাসীদের অধিকারকে স্বীকৃতি না দেওয়া জাতীয় আইনগুলোর সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করতে হবে।

এছাড়াও, আদিবাসী জনগণের অধিকার ও স্বীকৃতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংবিধান ও নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এমন কিছু সুপারিশ হল:

১. আদিবাসী জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা:

আদিবাসী জনগণের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত, যাতে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়। এতে তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও পরিচয়ের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকারে প্রবেশ করতে পারবে।

২. সামাজিক সুরক্ষা ও উন্নয়ন প্রকল্প:

আদিবাসী জনগণের জন্য বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা এবং উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা এবং এই প্রকল্পগুলোতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. নীতি তৈরিতে আদিবাসী জনগণের অংশগ্রহণ:

জাতীয় নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোতে আদিবাসী জনগণের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা উচিত। এতে তাদের প্রয়োজন ও ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে এবং তারা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশীদার হতে পারবে।

৪. ভূমি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার:

আদিবাসী জনগণের ঐতিহ্যবাহী ভূমি রক্ষার জন্য আইনগত

ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এ লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রাণালয়ের মতো সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রাণালয় অপরিহার্য।

৫. সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি:

আদিবাসী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমে আদিবাসী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এটি অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়া গড়ে তুলবে।

৬. তথ্য ও গবেষণার সুযোগ:

আদিবাসী জনগণের অধিকার এবং জীবনযাত্রার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা উচিত। এই তথ্য গবেষণাগুলো তাদের নীতিগত অধিকার ও উন্নয়নে সহায়ক হবে।

৭. প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ:

আদিবাসী জনগণের জন্য আইনি ও প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া উচিত, যাতে তারা তাদের অধিকার দাবি করতে সক্ষম হয়।

আমার বিশ্বাস এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করলে বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণের অধিকার ও সংস্কৃতির রক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, যা তাদের উন্নয়ন ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

উপসংহার

কলম্বিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নরওয়ে, ফিলিপাইন এবং ফিনল্যান্ডের মতো দেশগুলোর অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য আদিবাসী জনগণের অধিকার স্বীকৃতি ও সুরক্ষায় মূল্যবান পাঠ প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, কলম্বিয়ার ১৯৯১ সালের সংবিধান একটি বহু সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে আদিবাসী জনগণের স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের উল্লেখযোগ্য অধিকার প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং জাতীয় কংগ্রেসে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব। এই ব্যবস্থাগুলো আদিবাসী গোষ্ঠীগুলিকে ক্ষমতায়িত করে, তাদের নিজস্ব রীতি অনুযায়ী শাসন করার সুযোগ দেয়। একইভাবে, কানাডার ১৯৮২ সালের সংবিধান আইন অনুযায়ী বিদ্যমান আদিবাসী এবং চুক্তির অধিকারগুলি স্বীকৃতি দেয়, যা আদিবাসী ভূমির অধিকার ও স্বায়ত্তশাসন রক্ষায় একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামো তৈরি করে এবং আদিবাসীদের স্বায়ত্তশাসনে আইনি ভূমিকাকে জোরদার করে।

অস্ট্রেলিয়ার নেটিভ টাইটেল আইন ১৯৯৩ অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদের ভূমির সাথে তাদের ঐতিহাসিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মালিকানা দাবি করতে সহায়তা করে। ফিলিপাইনের ১৯৯৭ সালের আদিবাসী জনগণের অধিকার আইন (আইপিআরএ) আদিবাসী জনগণকে তাদের পুরনো অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকার করে, ফলে তাদের ভূমি এবং সাংস্কৃতিক অখন্ডতা রক্ষা করার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। নরওয়ের সামি সংসদ প্রতিষ্ঠা একটি মডেল হিসেবে কাজ করে যা আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় আদিবাসীদের কণ্ঠস্বরকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ ও স্বায়ত্তশাসনকে নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশের জন্য, এই উদাহরণগুলো স্পষ্ট করে যে, আদিবাসী জনগণের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সাংবিধানিক সংস্কারের তীব্র প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে বিদ্যমান অনুচ্ছেদগুলো সংশোধন এবং আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর জন্য ভূমির অধিকার, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব এবং সাংস্কৃতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ বিধান অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এই স্বীকৃতি প্রতিফলিত হতে পারে। এছাড়াও, জাতীয় আইনগুলোকে আন্তর্জাতিক কাঠামোর সাথে যেমন জাতিসংঘের আদিবাসী জনগণের অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কনভেনশন ১৬৯ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে পারলে, বাংলাদেশের সংবিধান বৈশ্বিক মানগুলোর সাথে সংগতিপূর্ণ হবে, যাতে আদিবাসী অধিকারসমূহের আত্ম-পরিচয়, সম্মান ও সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।

অবশেষে, আমার মতে এই সংস্কারগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার সংবিধানের মূল লক্ষ্যগুলি অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করতে পারে, যা তার প্রস্তাবনায় উল্লেখিত একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, মৌলিক মানবাধিকারের সুরক্ষা এবং সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হয়। এই সংস্কারের প্রতি অঙ্গীকার শুধুমাত্র আদিবাসী জনগণের জন্য গণতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে প্রসারিত করবে এমন নয়, বরং বাংলাদেশের সার্বিক গণতান্ত্রিক কাঠামোকে শক্তিশালী করবে।

বঙ্গ, বাঙালী, বাংলাদেশ ও আদিবাসী

॥ শক্তিপদ ত্রিপুরা ॥

মানুষ পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, ও প্রান্ত থেকে এ প্রান্ত চষে বেড়িয়েছে জীবন ও জীবিকার তাগিদে। কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবন ও পশু পালন বিদ্যা অর্জনের আগে মানুষের জীবন ছিল যাযাবর। মানুষ যখন ফল-মূল উৎপাদন করতে শিখল এবং বনের পশু-পাখি লালন পালনের বিদ্যা অর্জন করলো তখন থেকে মানব সমাজের স্থায়ীভাবে বসবাসের যাত্রা শুরু হল। তথাপি মানুষ ভাগ্যান্বেষণে পৃথিবীর এ প্রান্ত ও প্রান্ত চষে বেড়াচ্ছে এখনো। জীবন-জীবিকার তাগিদে বা কোন রাজনৈতিক কারণে একই জনগোষ্ঠীর মানুষ মূল জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নূতন জাতি গঠন করেছে আবার বহু জাতি মিলে এক নতুন জাতি গঠিত হয়েছে- এমন দৃষ্টান্ত মানব সমাজের ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশ তথা ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতির ইতিহাস যদি খতিয়ে দেখি তাহলে এর সত্যতা মিলবে। ভারত উপমহাদেশের গারো, ত্রিপুরা, কোচ, বোড়ো বর্তমানে- এক একটি পৃথক জাতি অথচ একসময় তারা সবাই এক জাতির মানুষ ছিল। অপরদিকে কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুন্ডা ইত্যাদি এবং আর্য-অনার্য রক্তের সংমিশ্রণে বর্তমান বাঙালী জাতি জন্মলাভ করেছে। মানব সমাজের ক্রমবিকাশে এ ধরনের উত্থান-পতন, গঠন-ভাঙন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বিশেষ। অনাদিকাল ধরে মানব সমাজে এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

প্রসঙ্গ: বঙ্গ, বাঙালী ও বাংলাদেশ:

'বাংলাদেশ' নামক স্বাধীন ভূখন্ডের জন্ম ১৯৭১ সালে। বাঙালী জাতির মধ্যে অনেকেই মনে করেন 'বাংলাদেশ'- শুধুমাত্র বাঙালীর দেশ। কিন্তু রূঢ় বাস্তবতা হল- বাংলাদেশে বহু জাতি ও বহু ধর্মের লোক বাস করে। বর্তমান বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডটি পূর্বে বিভিন্ন নামে বহু খন্ডে বিভক্ত ছিল। এ অঞ্চল পূর্বে গৌড়, রাঢ়, সুক্ষ্ম, হরিখেল, সমতট, বঙ্গ, বরেন্দ্র ইত্যাদি নামে খ্যাত ছিল। এইসব অঞ্চলে শত হাজার বছর ধরে বহু আদিবাসী জাতি বসবাস করে আসছে। এই অঞ্চলে বাঙালী জনগোষ্ঠীও শত শত বছর ধরে বসবাস করে আসছে। এই নিবন্ধে এইসব বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা থাকবে বিশেষত: বিভিন্ন ঐতিহাসিক, গবেষক ও লেখকের বক্তব্যের আলোকে।

ড. আহমদ শরীফ বলেছেন, "বঙ্গ, বাঙালী- এই অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর পরিচয় আধুনিক কালের। প্রাচীনকালে বঙ্গ বা বাঙালী জনগোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল গৌড়, রাঢ় ও পুন্ড্র নামে পরিচিত ছিল। তিনি আরো বলেন, পরবর্তীতে গৌড় রাঢ় পুন্ড্র এর পাশাপাশি সুক্ষ্ম, হরিখেল, কামরূপ, সমতট, বঙ্গ, বরেন্দ্র ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়। বঙ্গ অঞ্চলটি ঢাকা, পাবনা ও ময়মনসিংহ; হরিখেল অঞ্চলটি পার্বত্য ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে; বরেন্দ্র- বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, কোচবিহার, মিথিলা নিয়ে; সমতট- কুমিল্লা ও নোয়াখালী নিয়ে; গৌড়- রাজশাহী, মালদহ, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ; রাঢ়- বর্ধমান বিভাগ নিয়ে গঠিত।" *[বাংলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব- আহমদ শরীফ, পৃষ্ঠা- ৯, ১১।]*

মমতাজুর রহমান তরফদার বলেন, "সুদুর অতীতে পূর্ব ভারতে কোন একভাষিক রাষ্ট্রস্বত্তা বা একভাষিক জাতিসত্ত্বা ছিল না। .... একটি বিশেষ নামে পরিচিত কোন নিরবিচ্ছিন্ন ভৌগলিক এলাকাও ছিল না। এখানে ছিল কতগুলো খন্ড খন্ড জনপদ এবং অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও তিব্বতী-চীনা ভাষাভাষি বহু কোম বা বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর লোকজন। .... বাংলা বা বাঙালী জনগোষ্ঠী নামে তখনো কোন অঞ্চল অভিহিত হয়নি। সেকালের বঙ্গ গড়ে উঠেছিল বর্তমান ঢাকা, ফরিদপুর এবং খুব সম্ভব খুলনা ও বরিশালের অংশগুলি নিয়ে।" *[সূত্র- প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতি (প্রবন্ধ), মমতাজুর রহমান তরফদার, বাঙালীর আত্মপরিচয়, সম্পাদনা- মুস্তাফা নুর উল ইসলাম, পৃষ্ঠা- ৫৫।]*

মাহবুবুল আলম তার 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন, "বর্তমান বাঙালী জনগোষ্ঠী বহুকাল ধরে নানা জাতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এর মূল কাঠামো .... সমগ্র বাঙালী জনগোষ্ঠীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ক. প্রাক আর্য বা অনার্য জনগোষ্ঠী ও খ. আর্য নরগোষ্ঠী। এদেশে আর্যদের আগমনের আগে অনার্যদেরই বসতি ছিল। ঐ প্রাক আর্য জনগোষ্ঠী বাঙালী জীবনের মেরুদন্ড। তিনি আরো বলেন, বৈদিক যুগে আর্যদের সংগে বাংলাদেশবাসীর কোন সম্পর্ক ছিল না। বৈদিক গ্রন্থাদিতে বাংলার নর-নারীকে অনার্য ও অসভ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলার আদিম অধিবাসী আর্য জাতি থেকে উদ্ভূত হয়নি। আর্য পূর্ব জনগোষ্ঠী মূলত: নেগ্রিটো, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও বোট-চীনিয়- এই চার শাখায় বিভক্ত ছিল।"

সুনীতি কুমার ঘোষ বলেন, "বিভিন্ন জনগোষ্ঠী রক্তের সংমিশ্রনে বাঙালী জাতির উদ্ভব হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে তিনটি নর গোষ্ঠী প্রথম- সাঁওতাল. কোল, মুন্ডা ইত্যাদির পূর্ব

পুরুষ অষ্ট্রিক ভাষাভাষি বাংলার আদিম অধিবাসী, দ্বিতীয় দ্রাবিড় ভাষাভাষি ভূমধ্য সাগরীয় নরগোষ্ঠী- যারা ভারতে প্রবেশ করে হরপ্পা সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। এবং তৃতীয় আর্য ভাষাভাষি আলপীয় নরগোষ্ঠী। বাঙালী জাতি গঠনে সাওঁতাল, কোল, ভিল ও মুন্ডা নরগোষ্ঠী অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশী।"

'বাংলার ইতিহাসের ধারা' গ্রন্থে ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে গঠিত বাঙালীর জাতির মধ্যে মিশ্রণের হার এভাবে দেখিয়েছেন: বাঙালী রক্তের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ অষ্ট্রেলীয়, ২০ ভাগ মঙ্গোলীয়, ১৫ ভাগ নেগ্রিটো, ৫ ভাগ অন্যান্য নানা জনগোষ্ঠীর রক্ত মিশেছে। নিষাদ, কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুন্ডা, মাল পাহাড়ী প্রভৃতি হল আদি-অষ্ট্রেলীয় এবং কিরাত, রাজবংশী, কোচ, মেচ, মিজ্জার, কুকি, চাকমা, আরাকানী প্রভৃতি হচ্ছে মঙ্গোলীয়।"

ঐতিহাসিক কৈলাস চন্দ্র সিংহ তাঁর 'রাজমালা' গ্রন্থে বলেন- "চন্দ্রবংশীয় সুবিখ্যাত নরপতি যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুবংশে 'বলি' নামে এক নরপতি ছিলেন। বলিরাজ পত্নী মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে পাঁচটি পুত্র লাভ করেন। বলির ক্ষেত্রজ পুত্রগণ- অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুক্ষ্ম ও পুন্ড্র আখ্যাপ্রাপ্ত হন। তাহারাই পূর্ব ভারত পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া এক একটি প্রদেশে রাজদন্ড ধারণ করেন। স্থাপয়িতার নামানুসারে সেই রাজ্য অঙ্গ. বঙ্গ. কলিঙ্গ. সুক্ষ্ম ও পুন্ড্র আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিল।"

তিনি আরো বলেন, "প্রাচীন সুক্ষ্ম বা ত্রিপুরার পরিমাণ ৭৫,০০০ বর্গমাইল অপেক্ষা ন্যূন ছিল না বলিয়া বোধ হয় না। তৎকালে সমগ্র কুকি প্রদেশ, মিতাই রাজ্য, কাছাড়, শিলহট্ট (শ্রীহট্ট), চট্টগ্রাম ও নওয়াখালী ঐ সুক্ষ্ম বা ত্রিপুরার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল।" *[সূত্র: রাজমালা, কৈলাশ চন্দ্র সিংহ, পৃষ্ঠা- ৫৭।]*

মাহবুবুল আলম তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন, "রাঢ়, সুক্ষ্ম, পুন্ড্র, বঙ্গ প্রভৃতি শব্দের সাহায্যে বিশেষ জাতি বা উপজাতি বুঝানো হত। .... রাঢ় বলতে পশ্চিম বঙ্গ, সুক্ষ্ম বলতে দক্ষিণ বঙ্গ, পুন্ড্র বলতে উত্তর বঙ্গ, বঙ্গ বলতে পূর্ব বঙ্গ, সমতট হরিকেল বলতে পূর্ব বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানকে বুঝায়।"

শ্রী পূর্ণ চন্দ্র দেববর্মা বলেন, "প্রাচীন আর্যগণ কামরূপ ও আরাকানের (রাক্ষেয়াং) মধ্যবর্তী চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরাকে সুক্ষ্মদেশ বলিতেন। এক সময়ে এই রাজ্য উত্তরে তৈরঙ্গ নদী হইতে দক্ষিণ রোশাং (রাক্ষেয়াং) দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্রহ্ম ভাষায় ইহাকে পাটিকারা বলে। হিউয়াং তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে 'সিউকি' নামক গ্রন্থে এই দেশকে কমলাঙ্ক ও চটলকে সিউলি চটলো বা শ্রীচটলো উল্লেখ করিয়াছেন।" *[সূত্র: চট্টগ্রামের ইতিহাস- পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা।]*

পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা আরো বলেন, "পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, আর্যগণ ভারতে আসিবার পূর্ব হইতে এই দেশ পরাক্রান্ত 'কিরাত' নামক এক জাতির বাসস্থান ও কিরাত রাজার শাসনাধীন ছিল। রাজা 'ত্রিপুর' কিরাত জাতির নামের পরিবর্তে স্বীয় নামানুসারে স্বীয় রাজ্যের নাম 'ত্রিপুরা' এবং স্বীয় জাতির নাম 'ত্রিপুরা জাতি' বলে প্রচার করেন। তখন ত্রিপুরা রাজ্য ও ত্রিপুরা জাতি প্রতিষ্ঠা পায়। *[সূত্র: চট্টগ্রামের ইতিহাস- শ্রী পূর্ণ চন্দ্র দেববর্মা।]*

গোলাম মুরশিদ তাঁর 'হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেন, "সেই প্রাচীন কালে যে আদিবাসীরা এ অঞ্চলে বাস করতেন, তাদের রক্ত এখনো আমাদের ধমণীতে বহমান। তিনি আরো বলেন, সত্যি বলতে কি, বাংলা ভাষার বয়স এক হাজার বছর হয়েছে কি না সন্দেহ।"

বিষ্ণু পুরাণের অনুবাদক উইলসন বলেন, "ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও আরাকান প্রদেশ নিয়ে পুরাকালে 'সুক্ষ্ম দেশ' গঠিত হইয়াছিল।" *[সূত্র: চাকমা জাতি- সতীশ চন্দ্র ঘোষ, পৃষ্ঠা- ২৪।]*

ত্রিপুরা মহারাজারা প্রাচীন কালে 'ফা' উপাধি গ্রহণ করতেন। রত্নফার আমল থেকে ত্রিপুরা মহারাজারা 'মানিক্য' উপাধি ধারণ করেন। মহারাজ হামতরফা বীর রাজ ৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন আরোহন করেন। এ মহারাজার রাজত্বকালে প্রথম বর্তমান চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনবসতি গড়ে উঠে ও আবাদ করা হয় বলে জানা যায়। এবিষয়ে চিটাগাং গেজেটিয়ার- এ উল্লেখ আছে- 'King Bira Raja of Tippera (Tripura) was the founder of Chittagong Hill Tracts in 590.' তিনি ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশ জয় করেন এবং শেষার্ধে আরাকান রাজ্য জয় করে ত্রিপুরার সীমানা সম্প্রসারিত করেন। *[সূত্র: ত্রিপুরা জাতির মানিক্য উপাখ্যান- প্রভাংশু ত্রিপুরা, পৃষ্ঠা- ৪৮।]*

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ হোটেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সময় এক ফোল্ডার প্রকাশ করা হয়। ঐ ফোল্ডারে উল্লেখ করা হয় যে, 'Historically Chittagong was a small fishing village in the ancient kingdom of Tippera.'

P Sandy's view in AD 590: 'The Tripura Raj comprised the present British district to Chittagong, Noakhali, Tippera, Sylhet, Kachar, the Garo Khasi Gaintia Hills, Lushai land and the Chittagong Hill Tracts Tripura, Saigal (1917; 494).

Imperial Gezetteer of India Provincial Series Eastern Bengal and Assam-এর ৬৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে যে, 'The ancient Kingdom of Tippera at

various times extended its rules from the Sunderban in the west to Burma in the east and north was as far as Kamarup.'

সতীশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, "ষোড়শ শতাব্দির প্রারম্ভে (১৫১২ খ্রি:) চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া বিভিন্ন শক্তির মধ্যে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে হিন্দু, মুসলমান ও মঘ জাতিত্রয়ের রুধিধারায় চট্টগ্রাম রঞ্জিত হয়। ত্রিপুরা মহারাজা ধন্যমানিক্যের ... সেনাপতি রায় চয়চাগ ..., বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ সুলতান হুসেন শাহ... এবং প্রবল পরাক্রান্ত আরাকানাধিপতি মেং রাজার... চট্টলের সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শেষ ফলে মুসলমান ও মঘদিগের ভূজগর্ব খর্ব করিয়া সেনাপতি চয়চাগ চট্টলবক্ষে বিজয় বৈজয়ন্তী সংস্থাপন করেন।" *[সতীশ চন্দ্র ঘোষ- চাকমা জাতি, পৃষ্ঠা- ২৪।]*

সতীশ চন্দ্র ঘোষ আরো বলেন, "১৫২২ খ্রিষ্টাব্দে মঘরাজ গজাবদিগকে পরাজিত করত: চট্টগ্রাম অধিকার করেন। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে হুসেন শাহের উপযুক্ত পুত্র সুলতান নাসির উদ্দিন নছরতসাহা স্বর্গগত পিতৃদেবের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত ...বাহুবলে চট্টগ্রাম পনুঃরুদ্ধার করিয়াছিলেন।"

সতীশ চন্দ্র ঘোষ আরো বলেন, "১৫৩৬ খ্রিষ্টাব্দে বিজয় মানিক্য রাজা হইয়া চট্টগ্রাম পুনর্বার অধিকার করেন।"

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও লেখকের উক্তি ও বক্তব্য থেকে এটি পরিষ্কার যে, বাঙালী জাতি সৃষ্টি হবার আগে এই অঞ্চলে আদিবাসীরা বসবাস করত। মূলত: আদিবাসী জাতিসমূহের সংমিশ্রণে বাঙালী জাতি সৃষ্টি হয়েছে; যদিওবা এ জাতির রক্তে পাঠান, ইরানসহ বিভিন্ন জাতির রক্তও মিশ্রিত রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিভিন্ন সময়ে তখনকার সুক্ষ্ম দেশ (পার্বত্য ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, এবং আরাকান), সমতট (কুমিল্লা/ত্রিপুরা), গৌড় ও বর্তমান সিলেট, ময়মনসিংহ প্রভৃতি এলাকা আদিবাসী রাজাদের শাসনাধীনে ছিল। ঐতিহাসিক কৈলাশ চন্দ্র সিংহের মতে, 'বঙ্গ' নামটি এক আদিবাসী রাজার ৫টি ছেলের ১টি ছেলের নাম। 'বঙ্গ' নামক রাজপুত্র যে অঞ্চলটি শাসন করেন সেই রাজার নামানুসারে পরবর্তীতে সে অঞ্চলের নাম 'বঙ্গ' নামে খ্যাত হয়।

স্বাধীন বাঙালী জাতির আত্মপ্রকাশ (১৯৪৭-১৯৭১):

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান ভাগ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসী বাঙালী ও মুসলমান বিধায় এ অঞ্চলটি স্বাভাবিক কারণে পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রে এককভাবে বাংলা ভাষাভাষির সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা 'বাঙলা'কে উপেক্ষা করে 'উর্দু'-কে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা প্রদানের কারণে বাঙালী জাতি এর প্রতিবাদ জানায় এবং বাংলা ভাষাকে 'রাষ্ট্রভাষা' ঘোষণার দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। ভাষা আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারী করে। বাংলার ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। এ আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার শহীদ হন। আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষাকে 'রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার আন্দোলন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়েছিল ভাষা আন্দোলনে। বাংলার মানুষ পরিস্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারল যে, পাকিস্তানে বাঙালী জনগণের অধিকার সংরক্ষিত হবে না। এই উপলব্ধি থেকে বাঙালী জাতি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকে। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভুত্থান এবং সর্বশেষ একটি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামে প্রথম বাঙালী জাতির স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পায়। এই প্রথম বাঙালী জাতি একটি স্বাধীন জাতি পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হল।

আদিবাসী ও আদিবাসিন্দা- এক নয়:

কে বা কারা 'আদিবাসী'- এ নিয়ে বাংলাদেশে বিতর্ক চলছে। জোরালোভাবে বিতর্ক শুরু হয় তখন, যখন তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী দীপু মনি বলেন, "বাংলাদেশে কোন আদিবাসী নেই। বাংলাদেশে যারা বসবাস করে তারা উপজাতি, নৃ-গোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলে কয়েকশ' বছর ধরে বসবাস করছে। তারা অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এবং রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য এদেশে এসেছে। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতে সেখানকার আদিবাসীরা যে অর্থে আদিবাসী, সে অর্থে বাংলাদেশের আদিবাসীরা 'আদিবাসী' নয়। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতে আদিবাসী অস্তিত্বের সাথে ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশকারী ইউরোপীয়দের নৃশংসতা সম্পর্কিত।" তিনি আরো বলেছেন, "বাঙালীরাই এদেশের প্রকৃত আদিবাসী।" *[সূত্র: সাপ্তাহিক রোববার, ৭ আগস্ট ২০১১, পৃষ্ঠা- ১১।]*

আমি মনে করি রাজনীতিক দিপু মনি বাঙালী জাতির উৎপত্তির ইতিহাস ও আদিবাসী সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা নেই অথবা তিনি ইচ্ছেকৃতভাবে ইতিহাস বিকৃতি করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যা কোনটাই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে না।

শব্দগত অর্থে 'আদিবাসী' ও আদি-বাসিন্দা- এর অর্থ সমার্থক হলেও প্রায়োগিক অর্থে এক নয়। বাঙালী-আদিবাসী সবাই এ অঞ্চলের আদি-বাসিন্দা, কিন্তু সবাই 'আদিবাসী' নয়। কারণ

জাতিসংঘের দৃষ্টিতে 'আদিবাসী' বলতে একই সাথে 'আদি-বাসিন্দা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী'-কে বুঝানো হয়। অপরদিকে কোন জনগোষ্ঠী আদিকাল থেকে কোন অঞ্চলে বসবাস করেছে এবং বর্তমানেও বসবাস করছে সে ধরণের জনগোষ্ঠীকে 'আদি-বাসিন্দা' বলা হয়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালী জাতি 'আদি-বাসিন্দা' হলেও 'আদিবাসী' নয়। কারণ বাঙালী জাতি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নয়, বর্তমানে বাঙালী জাতি একটি স্বাধীন জাতি এবং একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। সুতরাং বাঙালী জাতি এ অঞ্চলের 'আদি-বাসিন্দা' হলেও সার্বিক বিচারে 'আদিবাসী' অভিধার মধ্যে পড়ে না।

সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী দিপু মনি 'ইন্ডিজিনাস পিপলস' বা আদিবাসী সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির উপনিবেশ, নির্যাতন বিষয়সমূহের যুক্ততার কথা উল্লেখ করেছেন তা এক্ষেত্রে যথাযথ ও প্রযোজ্য নয়। আদিবাসী বা ইন্ডিজিনাস পিপলস বলতে কাদের বুঝায় তা জাতিসংঘের ভাষ্যে পরিষ্কার। জাতিসংঘ ভাষ্যমতে আদিবাসী জনগোষ্ঠী হল- (১) যে জনগোষ্ঠী আদি-বাসিন্দা অথচ প্রান্তিক, অধিকারহারা এবং আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়কালে যাদের কোন ভূমিকা ছিল না, কিংবা প্রান্তিক ভূমিকা, (২) যে জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় আইনের চাইতে প্রথাগত আইনের মাধ্যমে সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে, (৩) যাদের মধ্যে ধর্মীয় বহু মাত্রিকতা রয়েছে, (৪) যাদের ভূমির সাথে আধ্যত্মিক ও আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে।

সুতরাং জাতিসংঘ কর্তৃক আদিবাসী জনগোষ্ঠী নির্ধারণে যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার সাথে সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী দিপু মনির ধারণা বা কল্পনার কোন সামঞ্জস্য নেই। এসব বৈশিষ্টের আলোকে সংজ্ঞায়িত করতে চাইলে বাঙালী জাতিকে কোনভাবে 'আদিবাসী' বর্গে ফেলানো যায় না। সুতরাং ডা. দিপু মনি যে দাবী করেছেন বাঙালীরাই এদেশের প্রকৃত 'আদিবাসী' জাতিসংঘ ভাষ্যমতে তা সঠিক ও যথাযথ নয়, তবে বাঙালীরা অবশ্যই এ অঞ্চলের আদি-বাসিন্দা তা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়। ডা. দিপু মনি এখানে 'আদিবাসী' ও 'আদি-বাসিন্দা' শব্দ দু'টিকে সম অর্থে ব্যবহার করেছেন। এই দু'টি শব্দের শাব্দিক অর্থ একই হলেও প্রায়োগিক অর্থে একই অর্থ বুঝায় না।

বাঙালী জাতি- এ অঞ্চলের আদি-বাসিন্দাঃ

বাংলাদেশে বসবাসরত বাঙালী ব্যতিত ভিন্ন ভাষাভাষি আদিবাসী জাতিসমূহকে 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি দিলে বাংলাদেশে বাঙালী জাতি অ-আদি-বাসিন্দা হয়ে যায় না। বাঙালী জাতিও এই বাংলার আদি-বাসিন্দা। বাঙালী জাতি এ অঞ্চলে দু'দিক থেকে আদি-বাসিন্দা- ১) শংকর জাতি হিসেবে ও ২) ভূমিজসন্তান হিসেবে। সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকগণ বলেছেন- বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে বাঙালী জাতির সৃষ্টি। ভূপেন্দ্র নাথ বলেছেন- এ সংমিশ্রণে শতকরা ৬০ ভাগ অষ্ট্রেলীয়, ২০ ভাগ মঙ্গোলীয়, ১৫ ভাগ নেগ্রিটো, ৫ ভাগ অন্য নানা নরগোষ্ঠীর রক্ত মিশ্রিত। নিষাদ, কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুন্ডা, মাল পাহাড়ী প্রভৃতি হল আদি অষ্ট্রেলীয় এবং কিরাত, রাজবংশী, কোচ, মেচ, ত্রিপুরা, মিজ্জার, কুকি, চাকমা, আরাকানী প্রভৃতি হচ্ছে মঙ্গোলীয়। [সূত্রঃ বাংলার ইতিহাসের ধারা- ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত।]

এইসব উল্লেখিত জাতিসমূহ সবাই আদিবাসী বর্গের জনগোষ্ঠী। সুতরাং বাঙালী জাতির রক্তে ৮০ ভাগ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রক্ত মিশ্রিত। শংকর জাতি হিসেবে বিবেচনায় বাঙালী অবশ্যই এ অঞ্চলের একটি আদি-বাসিন্দাজাত জাতি। অপরদিকে ভূমিজ সন্তান হিসেবেও বাঙালী জাতি এ অঞ্চলে 'আদি-বাসিন্দা' হিসেবে বিবেচনার দাবী রাখে। প্রায় হাজার বছর আগে বাঙালী জাতির সৃষ্টি। এই অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে বাঙালী জাতি সৃষ্টি হয়েছে। জাতি হিসেবে বাঙালী জাতি এই অঞ্চলে সৃষ্টি এবং বাঙালী জাতির প্রথম প্রজন্ম এই অঞ্চলে জন্মলাভ করেছে ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। সুতরাং বাঙালী জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলের ভূমিজ সন্তান। ভূমিজ সন্তান হিসেবেও বাঙালী জাতি এই অঞ্চলের আদি-বাসিন্দা।

আদিবাসী স্বীকৃতির প্রশ্নে ভীতি ও বিভ্রান্তিঃ

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, 'আদি-বাসিন্দা' বা 'আদিবাসী' দু'দিক থেকে এদেশের আদিবাসীরা 'আদিবাসী' হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশ সরকার এদেশের আদিবাসীদের কখনো 'আদিবাসী', কখনো 'উপজাতি', 'নৃ-গোষ্ঠী' ইত্যাদি অভিধায় আখ্যায়িত করেছে। বাংলাদেশের কোন কোন আইনে, নীতিমালায় 'আদিবাসী' বলা হয়েছে, কোন কোন আইনে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী', 'উপজাতি' ইত্যাদি বলা হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার যে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র আদিবাসী স্বীকৃতির বিষয়ে এখনো বিভ্রান্তি ও দোদুল্যমানতায় ভূগছে। আদিবাসী স্বীকৃতির প্রশ্নে কোন ভীতি কাজ করছে কি? আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হলে ভূমি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে আদিবাসীদের বেশী বেশী অধিকার প্রদান করতে হবে?

অনেকে অযথা সংশয় প্রকাশ করেন যে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি দিলে বাংলাদেশের ভূখন্ড বিপন্ন হয় কী না। কিন্তু প্রশ্ন হল- যেসব দেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে, সেসব দেশের ভূখন্ড বিপন্ন হয়েছে কি? যেসব দেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের ভূমি, শিক্ষাসহ যেসব অধিকার প্রদান হয়েছে তার

কারণে দেশের মূল জনগোষ্ঠী কিংবা ভূখন্ড কি বিপন্ন হয়েছে? পৃথিবীতে কোথাও এমন কোন নজির নেই। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে আদিবাসীরা 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃত নয়, কিংন্তু তারা আদিবাসীদের ন্যায় ভূমি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অধিকার ভোগ করছে। যেমন পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মেঘালয়, মিজোরাম, অরুণাচল ইত্যাদি প্রদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠী 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃত নয়, কিন্তু সেদেশে আদিবাসীরা প্রথাগত ভূমি অধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারসহ বিভিন্ন অধিকার ভোগ করছে।

বাংলাদেশের আদিবাসীরা বৃটিশ আমল থেকে এবং বাংলাদেশ আমলেও বিভিন্ন আইনে 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃত কিন্তু প্রথাগত ভূমি অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারসহ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। তবে এখানে এটিও উল্লেখ্য যে, বৃটিশ প্রণীত আইন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন আইন ও নীতিমালায় বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি থাকলেও সর্বশেষ পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসীদেরকে উপজাতি, নৃ-গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও সম্প্রদায় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন-২০১০ এ বাংলাদেশের আদিবাসীদের 'নৃ-গোষ্ঠী' 'উপজাতি' বলা হয়েছে। এই আইন প্রণয়নের সময় বাংলাদেশের খ্যাতিমান সমাজবিজ্ঞানী এইচ এফ আরেফিন, সাদেকা হালিম, মেসবাহ কামাল ও আইনুন নাহার প্রমুখ বাংলাদেশের আদিবাসীদের 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার সমাজবিজ্ঞানীদের প্রস্তাবকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানে পরিত্যাজ্য শব্দ 'উপজাতি' এবং জাতির পরিচয় দানের ক্ষেত্রে সাযুজ্যহীন শব্দ 'নৃ-গোষ্ঠী' আইনে সন্নিবেশিত করেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত আইনে আদিবাসী শব্দেরও ব্যবহার করা হয়েছে। এইসব আইন প্রণয়নের পূর্ব থেকে তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী দিপু মনিসহ সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ বলতে শুরু করেন- বাংলাদেশে কোন আদিবাসী নেই। এখান থেকেই পরিষ্কার যে, বাংলাদেশ সরকার আদিবাসী স্বীকৃতির প্রশ্নে নানা বিভ্রান্তি, হীনমন্যতা ও দোদুল্যমানতায় ভূগছে। বাংলাদেশের আদিবাসীরা জাতিসংঘ ভাষ্য মতে এবং ঐতিহাসিকভাবেও 'আদিবাসী' হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন আইন, নীতিমালা ও কোর্টের বিভিন্ন রায়ে এদেশের আদিবাসীরা 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আছে। তাহলে বাংলাদেশের সংবিধান ও নতুন আইনসমূহে দেশের আদিবাসীদের 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধা কোথায়?

আত্ম-পরিচয়ের অধিকার মানবাধিকার:

কোন জাতির নাম পরিবর্তন করা, কটুক্তি করা বা কোন জাতিকে নিয়ে মিথ্যার বেসাতি করা কাম্য নয়। কিন্তু সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী দীপু মনিসহ কোন কোন লেখক যেভাবে আদিবাসীদের প্রতি কটুক্তি, অপমানজনক ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য প্রদান করেছেন তা সত্যিই দুঃখজনক। সরকারের একজন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছে এটি আশা করা যায় না। বাংলাদেশের সংবিধানে মানবাধিকারের বিষয়গুলি স্বীকৃত। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন সনদে অনুস্বাক্ষর করেছে। সুতরাং বাংলাদেশ সরকার কিংবা সরকারের কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি কর্তৃক কোন জনগোষ্ঠীর মানবাধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ একেবারে কাম্য নয়। এটি সংবিধান ও অনুস্বাক্ষরকৃত সনদের সুস্পষ্ট লংঘন। প্রত্যেকটি জাতির আত্ম-পরিচয়ের অধিকার স্বীকৃত। এটি মানবাধিকারের অংশ। বাংলাদেশে ৫৪টির অধিক আদিবাসী জাতি রয়েছে। তারা শত ও হাজার বছর ধরে এই অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও ইতিহাস রয়েছে।

বাংলাদেশের এসব জাতিরা নিজেদের আদিবাসী মনে করে। আদিবাসী অঞ্চলের বাঙালী জনগণও এতদিন জেনে আসছে এরা আদিবাসী। বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানীরাও বলেছেন এরা উপজাতি বা নৃ-গোষ্ঠী নয়- এরা আদিবাসী। তাহলে আদিবাসী স্বীকৃতি দিতে কিসের এত দ্বিধা? কিসের কার্পণ্য? কিসের এত ভয়? আদিবাসী স্বীকৃতি দিলে কি কোন জাতি স্বাধীনতা দাবি করার অধিকার রাখে? না কি তাদের এমন অধিকার দিতে হয় যা কোন দেশের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়ে যায়? যেসব দেশ আদিবাসীদের 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে সে দেশের স্বার্থ কি ক্ষুন্ন হয়েছে? সেসব দেশের স্বাধীনতা কি বিপন্ন হয়েছে? আদিবাসী স্বীকৃতির সাথে কিছু ক্ষেত্রে ভূমি, শিক্ষা ও চাকরি সংক্রান্ত অধিকারের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু যেসব রাষ্ট্রে আদিবাসীদের 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে সেসব দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব কি ক্ষুন্ন হয়েছে?

'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি নেই সেসব দেশের নাগরিকেরাও তাদের দেশে ভূমি, শিক্ষা ও সস্কৃতির অধিকার ভোগ করছে। যেমন- ভারত। ভারতের আদিবাসীরা সে দেশে 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃত নয়; কিন্তু সেদেশের আদিবাসীরা জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত ভূমি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি অধিকার এবং এমন কি তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বহু অধিকার ভোগ করে থাকে। যেমন- মেঘালয়, মিজোরাম ও অরুণাচলের আদিবাসীরা ভূমি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অধিকার ভোগ করে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নঃ

৩০ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভ করে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। এই স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিষ্টান ও বাঙালী-আদিবাসী পাকিস্তানী সাম্প্রদায়িক-সামরিক শাসনের বিপরীতে একটি অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক ও শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন হল এবং ১৯৭২ সালে সংবিধান রচনা করা হল। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে যথাযথভাবে ধারণ করতে পারেনি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালী-আদিবাসী সকলেই অংশগ্রহণ করেছে, জীবন দিয়েছে, রক্ত দিয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা স্বীকার করা হয়নি। এটি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভংগীরই বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশের সংধিানে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। আদিবাসীদের ভূমির অধিকারসহ তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, শাসনতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রদান করা হয়নি। তাই প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের সংবিধান গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে পারেনি। সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা না থাকার কারণে স্বাধীনতার পর বিশেষতঃ ৭২-৭৫ সালে আদিবাসীদের চিরায়ত ভূমি হাতছাড়া হয়। এসময়ে সমতল অঞ্চলের আদিবাসীরা অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আদিবাসীদের জুমভূমি ও দখলীয় ভূমি, বন্দোবস্তী কিংবা লীজ নিয়েছে ভূমিখেকো বাঙালীরা আদিবাসীদের অজান্তে। ভূমির ওপর আদিবাসীদের সামাজিক মালিকানা পদ্ধতি সংবিধানে স্বীকৃত না থাকার কারণে ভূমি খেকোরা তথাকথিত লীজ বা বন্দোবস্ত করার মাধ্যমে আদিবাসীদের ভূমি বেদখল করতে সম্ভব হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আদিবাসীদের ভূমি মালিকানা ব্যবস্থা আলাদা। আদিবাসীদের ভূমি মালিকানা সামাজিক মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিতি। ভূমির ব্যক্তি মালিকানা বা বন্দোবস্তি আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি ব্যবস্থাপনা স্বীকার করে না। সেকারণে আদিবাসীরা ব্যক্তির নামে ভূমি বন্দোবস্তী বা লীজ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। বৃটিশ আমলে ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক মালিকানা স্বীকৃত ছিল বিধায় সেসময়ে আদিবাসীরা ভূমি হারায়নি। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর ভারতের সংবিধানে বিভিন্ন প্রদেশে বসবাসরত আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হলেও পাকিস্তানের সংবিধানে আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়নি।

১৯৭২ সালের সংবিধানেও আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমির অধিকার- 'সামাজিক মালিকানা' পদ্ধতি স্বীকার করে নেওয়া হয়নি। বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যক্তি মালিকানা, সরকারী মালিকানা ও সমবায় মালিকানা- এই তিন ধরণের মালিকানা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে মাত্র। আদিবাসীদের সামাজিক মালিকানা পদ্ধতি সংবিধানে স্বীকৃত না থাকায় স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি দেশের বিবেকহীন সম্পদ লোভী ভূমি খেকোরা আদিবাসীদের চিরায়ত ভূমি বেদখল করার সুযোগ করে নিয়েছে। এদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে '৭৫-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিশেষতঃ '৭৯-'৮০ সালে জিয়াউর রহমান সরকার কর্তৃক চার লক্ষাধিক সেটেলার পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক হারে ভূমি বেদখল, বনসম্পদ ধ্বংস ও সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়। এই সাম্প্রদায়িক হামলার কারণে আদিবাসীরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য নিজেদের গ্রাম ছেড়ে ভূমি, বাগান-বাগিচা ছেড়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরে যেতে বাধ্য হয়। হাজার হাজার পাহাড়ী দেশের বাইরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এসময় সেটেলার বাঙালীরা আদিবাসীদের ভূমিতে বসতিস্থাপন করে। অদ্যাবধি সেটেলার বাঙালীরা আদিবাসীদের ভূমি বেদখল করে রেখেছে।

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে আদিবাসীদের বেদখলকৃত ভূমি ফেরত দেওয়ার কথা রয়েছে। সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন না করে বরং চুক্তি লংঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। এলক্ষ্যে সরকার সেটেলার বাঙালীদের আদিবাসীদের জায়গায় পুনর্বাসন করছে, রোহিঙ্গাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনে উৎসাহ জোগাচ্ছে এবং আশ্রয়সহ নানা সহযোগিতা প্রদান করছে, রাস্তার দু'ধারে সেটেলার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নূতন নূতন রাস্তা নির্মাণ করছে, শিক্ষিত বাঙালী সেটেলার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন এবং আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিপরীতে বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশের আদিবাসী জাতিসমূহের জাতিগত নির্মূলীকরণের কার্যক্রম জোরদার করছে।

এই নিবন্ধে আদিবাসী, আদি-বাসিন্দা, নৃ-গোষ্ঠী, উপজাতি, বঙ্গ, বাঙালী, বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের

চেতনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এসব বিষয়ে আমাদের ধারণা রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিছু কিছু বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে বর্তমান বাস্তবতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বাঙালী-আদিবাসী সবাই এদেশের নাগরিক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালী-আদিবাসী সবাই রক্ত দিয়েছে, জীবন দিয়েছে। একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে দেশে একটি গণমুখী সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে দেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি পাবে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হবে এবং আদিবাসী-বাঙালী, নারী-শিশু, কৃষক, শ্রমিক মেহনতি মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে- এটি সকলের কাম্য।

> 'আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দপুরুষ—কেউ বলে নাই, আমি বাঙালি।'
>
> ***৩১ অক্টোবর ১৯৭২ 'বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন' সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাবেব উপর গণপরিষদে প্রদত্ত এম এন লারমার ভাষণের অংশবিশেষ***

কবিতা

রক্তে রঞ্জিত পাহাড়

।। শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা ।।

চারিদিকে বাতাসে ভেসে আসছে ঘর পোড়ার গন্ধ
দাউ দাউ করে জ্বলছে দীঘিনালার লারমা স্কোয়ার
চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে জলন্ত অগ্নিশিখা
চারদিক থেকে শুধু চিৎকার- আমাদের বাঁচাও আমাদের বাঁচাও

সেদিন ১৯ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত
হঠাৎ ফোনে রিং; ফোনটা দীঘিনালা থেকে এক ছোটবোনের
কাঁপা কাঁপা গলার সুর নিয়ে কথা বলছে
আমার বুকের ভেতর থেকে তার জন্য বেদনা আর মায়া হচ্ছিলো।
কাঁদো কাঁদো গলায় বলছে- দিদি, আমরা বাড়ি থেকে পালিয়ে গহীন অরণ্যের ঝিরির মধ্যে আছি,
আমাদের বাড়ির উদ্দেশে ক্যাম্প থেকে তেড়ে আসছে সেটেলার বাঙালিরা, আমাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিবে।

আমি দূর থেকে শুধু তার অসহায়ত্বের কথা শুনেছি নিরুপায় হয়ে।
সে মূহূর্ত থেকে বুকের ভেতরে প্রতিরোধের অগ্নি দাউ দাউ করে উঠলো।
মনে মনে শপথ নিলাম, তোমার এ চোখের জল, তোমার যন্ত্রণা একদিন তাদের ফেরত দেবো,
তোমাদের চোখের জল বৃথা যাবে না।

কাপ্তাই হ্রদে উত্তাল ঢেউ দেখছো?
সেটা তার সুন্দরের রূপ নয়
সেটি রাগ, ঘেন্না, সেটি তার প্রতিবাদের স্বরূপ
সেখানে নিহিত অজস্র জুম্ম জনগণের ব্যথাভরা অশ্রু।

রক্তের স্রোতে বহমান বড়গাঙ
শিশুরা কেঁদে উঠে পাহাড় জুড়ে
লাশের সারির সংখ্যা বেড়েই চলেছে
তবুও বারুদের ভেতর জন্মাচ্ছে প্রতিরোধ
শত সংগ্রামীর বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে-
বলছে মুক্তি চাই, অধিকার চাই, গণতন্ত্র চাই,
চুক্তি বাস্তবায়ন চাই।
গর্জে উঠবে বীর জুম্ম তরুণ নির্ভীক হয়ে।
জুম্ম জাতির শত কান্না, বেদনা,
মৃত্যুর মাঝেও ভূমিষ্ঠ হবে নবাগত শিশু
অবুঝ শিশুর ক্রন্দন হবে একদিন এক সাহসী কণ্ঠের ধ্বনি।

অগ্নিঝরা পাহাড়

॥ হ্লানুসাং মারমা ॥

ওহে পথভ্রষ্ট সমাজ,
নয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী-নয় শ্রবণ প্রতিবন্ধী,
তবে কেন নীরব দর্শক!
সাংবিধানিক মুখোশধারী শাসক,
চাপিয়ে দেয় পাশবিক নীতি
গ্রাস করে আমার ভাষা, সংস্কৃতি।

কাশ্মীর, ফিলিস্তিনের প্রতিরূপে-পার্বত্য চট্টগ্রাম,
বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রামই হাতিয়ার!
মানুষরূপী পশু কর্তৃক মা-বোনের সম্ভ্রম,
প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিত্যসঙ্গী।
কলঙ্কিত- সৃষ্টির সেরা জীব,
জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে অধম।
শাসনের নামে কুশাসন,
শান্তি বর্ষণে কালক্ষেপণ!
অসভ্য ধ্বংসলীলার পদক্ষেপ,
যন্ত্রণায় দগ্ধ আক্ষেপ।

ভূমিপুত্রদের জাতিগত নির্মূল,
দমন-নিপীড়নে বুনোফুল।
পৈশাচিক কায়দায় ভূমিদস্যু
অগ্নিসংযোগে অঘোষিত নরপশু।
এ কেমন কুশ্রী-
শক্তির বহিঃপ্রকাশ,
পিছপা হয় না-
করিতে সর্বনাশ!

মানবাধিকার লঙ্ঘন,
থামে না ধ্বংসের বীজ রোপণ।
জননী হারায় পুত্রধন,
দমিয়ে রাখে সত্যবচন।
পদে পদে মরণফাঁদ,
সাম্প্রদায়িকতার উন্মাদ।

অস্তিত্ব রক্ষার্থে আত্মবলিদান,
হয় না তবু বিভেদপন্থীর অবসান।
অধিকার আদায়ে অপবাদ-
দেশদ্রোহী, অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত!

সেনাশাসন জিইয়ে রেখে,
সামরিকীকরণ অব্যাহত।
ভাঙ্গনের খেলায় করুণ সুর,
প্রকম্পিত হয় দূর-বহুদূর।

কোথায় সভ্যতা, কোথায় মনুষ্যত্ব!
পাহাড় জুড়ে কেবল ক্ষত-বিক্ষত!
সংকীর্ণ চিন্তাধারায়, বর্বর মানসিকতায়, পাবে না প্রবেশের দ্বার-
যুক্তিজগতে, হবে সব ছাড়খার।

পাহাড়ে চলো তরুণ

॥ ভদ্রাদেবী তঞ্চঙ্গ্যা ॥

বেলাতো গড়িয়ে গেলো বহুদূর,
প্রেমিকার হাত ধরে ঘুরবার সময় নয় এখনই,
বন্ধুদের সাথে রেস্টুরেন্টে যাওয়ার সময় নয়,
একবার ফিরে তাকাও শুধু,
জুম পাহাড়ের নিপীড়িত, অবহেলিত জুম্ম জনগণের দিকে।
আমার পাহাড়ের উপর শকুনের নজর লেগেছে,
জুম্মদের উপর শাসকগোষ্ঠীর শোষণ চলছে।
আমার ভিটেমাটি বেদখল করে,
উন্নয়নের নামে উচ্ছেদ করেছে আমায়।

আজ আমি শুনতে পাই,
ঝিরির ঝর্ণার শব্দের সাথে আমার বোনের চিৎকার,
শুনতে পাই তার ক্রন্দন ধ্বনি,
আজ আমি দেখতে পাই,
আমার মায়ের আতঙ্কের চেহারা,
আমার মাকে দুঃখ স্পর্শ করেছে,
মায়ের চোখে অশ্রু নয় যেন রক্ত ঝরছে।
আমার বোনের পরিধান বস্ত্রে লেগে আছে রক্তের ফোঁটা,
রাষ্ট্র আমার বুকে গুলি ছুঁড়েছে,
আমার ভূমি কেঁড়ে নিবে বলে।
আজ দীঘিনালা, লামা, লংগদুর পথে আমার বোন লাঞ্ছিত,
কালিন্দীপুর, খাগড়াছড়ি, রুমার পথে আমার ভাইয়ের লাশ।
নিরাপত্তাহীনতার আর কতদিন?

সময় তো এসেছে ঐতিহাসিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে,
চাঁদের নিভূ নিভূ আলোতে ছুটে চলার।
আমার বোনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে,
সংগ্রামী মায়ের মুখে হাসি ফোঁটাতে,
নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতা দিতে,
জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে।

চলো তরুণ জুম্ম জণগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে,
লোগাং, লংগদু, শঙ্খ, মাইনী, চেঙ্গী নদীর কোলে
লারমার দেখানো পথের পথিক হয়ে।
লারমার আদর্শ ধারণ করে হয়ে ওঠো তুমিও বিপ্লবী,
হয়ে ওঠো জুম্ম জাতির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামী।

তরুণ তুমি সংগ্রামী হও,
পাহাড়ে চলো জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষায়।
শুনছো তুমি?
বুলেটের ভয়ে চুপ থাকা যাবে না,
শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে,
জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আমরা ফিরবো ঘরে,
যখনি অধিকারহারা, নিপীড়িত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত মানুষের মুক্তি হবে।
আর তখনি গেংখুলিরা আবার ফিরবে গ্রামে,
জুম্ম জনগণের দুঃখের পালাগান আর প্রতিবাদী সংগ্রামী গান নিয়ে।
বসন্তের আগমনে কোকিলেরা নতুন সুরে ডাক দিবে,
শরতের কাঁশফুল সাংগু, চেঙ্গী, মাতামুহুরী, মাইনী নদীর তীরে ফুঠবে,
শীতের কুয়াশা ভরা সকালে সূর্য মিষ্টি হাসি দিয়ে চতুর্দিকে নতুন রূপ দেবে।
বারুদের উপর জন্ম দেবে নতুন এক সুবাসিত ফুল,
সে ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবে পাহাড়ের প্রেয়সীরা।

দেশকে আমি যেভাবে ভালোবেসেছি, যেভাবে আমার মনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি, যেভাবে আমি কোটি কোটি মানুষের একজন হয়ে দেখেছি, সেইভাবে এই মহান গণপরিষদে বলেছি।

সংবিধান-বিলের উপর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে এম এন লারমার গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ

নভেম্বর স্মরণে

॥ কাঞ্চনা চাকমা ॥

সেই মানুষটাকে স্মরণ করছি
যিনি ছিলেন পাহাড়ে সাম্যের স্বপ্নদ্রষ্টা
যিনি প্রথম অধিকারহারা, শোষিত-নিপীড়িত শ্রেণির অধিকারের কথা অকপটে বলেছিলেন
সংসদে, রাজপথে

আজ এই নভেম্বরে আমি সেই বিপ্লবীকেই স্মরণ করছি
যিনি ছিলেন বট বৃক্ষের মতো সুশীতল ছায়াময়
যিনি ছিলেন নতুন সূর্যোদয়ে বাঁচার লড়াইয়ের স্বপ্নগামী
যিনি এখনো মিশে রয়েছেন পাহাড়ের প্রতিটি কোণায়
তারুণ্যের কণ্ঠে দ্রোহের শ্লোগানে-
এম এন লারমার হাতিয়ার
গর্জে উঠুক আরেকবার

হে মহান নেতা,
নভেম্বরে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি তোমায়
তুমি চির অমর, অমর হয়েই বেঁচে থাকো পাহাড়ের বুকে।

‘কৃষির উন্নয়নের দিকে যেমন আমাদের নজর দিতে হবে, তেমনি আমাদের শিল্প ও কল-কারখানার দিকেও নজর দিতে হবে। শিল্প ক্ষেত্রে আমরা যেন পিছনে পড়ে না থাকি এবং শিল্পোন্নতিতে আমরা যেন অন্য রাষ্ট্রের বা উন্নতিশীল দেশের সম মর্যাদায় পৌঁছতে পারি, সেদিকে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আমাদের যেসব কল-কারখানা এখনও অকেজো বা অক্ষম হয়ে পড়ে আছে, সেগুলো আস্তে আস্তে কর্মক্ষম করতে হবে এবং ধীরে ধীরে সেগুলিকে উন্নতমানে নিয়ে যেতে হবে। আমরা যেন সব বিষয়ে স্বনির্ভরশীল হতে পারি।’

– এম এন লারমা
বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনার উপর মতামত,
২৩ জুন ১৯৭৩, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক, খণ্ড ২ সংখ্যা ১৭

বিশেষ প্রতিবেদন

খাগড়াছড়ি, দীঘিনালা ও রাঙ্গামাটিতে সাম্প্রদায়িক হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট

গত ১৮-১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খাগড়াছড়ি সদরে ও দীঘিনালায়, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রাঙ্গামাটি সদরে এবং সর্বশেষ ১লা অক্টোবর ২০২৪ খাগড়াছড়ি সদরে বিশেষ মহলের সহযোগিতায় সেটেলার বাঙালিরা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কার্যালয়সহ জুম্ম জনগণের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা ও জুম্মদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ও ঘরবাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংঘটিত করেছে। উক্ত সাম্প্রদায়িক হামলায় ৪ জন জুম্ম নিহত হয়েছে (সেটেলার বাঙালি কর্তৃক দীঘিনালায় একজন জুম্ম, খাগড়াছড়ি সদরে সেনাবাহিনীর গুলিতে ২ জন জুম্ম এবং রাঙ্গামাটি সদরে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক একজন জুম্ম)। এছাড়া এই সাম্প্রদায়িক হামলায় শতাধিক জুম্ম আহত হয়েছে, অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত ও লুণ্ঠিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কার্যালয়সহ শতাধিক ঘরবাড়ি ও দোকানপাট।

ঘটনার সূত্রপাত:

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, মো: মামুন (৪০) নামের এক সেটেলার বাঙালি খাগড়াছড়ি সদরের মধুপুর এলাকা থেকে গোল্ডি চাকমা (৪৫) নামে এক ব্যক্তির মোটরবাইকটি চুরি করে দ্রুত চালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রাস্তার পাশের একটি বৈদ্যুতিক খুঁটির সাথে ধাক্কা খেয়ে ওই চোর মো: মামুন বাইক থেকে পড়ে যায় এবং গুরুতর আহত হয়। তখনই আশেপাশের বাঙালি ও জুম্ম জনতা এসে "চোর, চোর" বলে মো: মামুনকে মারধর করে। মারধরের ফলে মামুন বেহুঁশ হয়ে যায়। পরে মামুনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ ও একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, নিহত বাইকচোর মো: মামুন একজন মূলত পেশাদার চোর। তার বিরুদ্ধে থানায় ১৭টি মামলা চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ১৪টি হচ্ছে চুরির মামলা, ৩টি মাদক সংক্রান্ত মামলা। এছাড়া ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে মৃত মামুনের স্ত্রী মুক্তা আক্তার কর্তৃক খাগড়াছড়ি সদর থানায় দায়েরকৃত হত্যা মামলায়ও মুক্তা আক্তার প্রধান আসামী হিসেবে ১। মো: শাকিল (২৭), পিতা- আব্দুল মান্নান, শালবন (শাপলার মোড়), খাগড়াছড়ি সদর; ২। রফিকুল আলম (৫৫), পিতা মৃত ওবায়দুল হক, পানখাইয়া পাড়া, খাগড়াছড়ি সদর; ও ৩। দিদারুল আলম

(৫০) পিতা মৃত ওবায়দুল হক, পানখাইয়া পাড়া প্রমুখ তিনজন সেটেলার বাঙালির নাম উল্লেখ করেছেন।

মো: মামুনের মৃত্যুর পরপরই সেটেলার বাঙালিরা সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে প্রচার করতে থাকে যে জুম্মরাই পরিকল্পিতভাবে মামুনকে মেরে ফেলেছে। এভাবে অপপ্রচার চালিয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি সদরের মধুপুরে হামলার চেষ্টা করে। এরপর ১৯ সেপ্টেম্বর দীঘিনালা ও খাগড়াছড়ি এবং ২০ সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটিতে সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়।

খাগড়াছড়ি সদরের মধুপুরে হামলার চেষ্টা:

মো: মামুনের মৃত্যুর পর অপপ্রচার চালিয়ে ১৮ সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যার পর থেকে সেটেলার বাঙালিরা খাগড়াছড়ি শহরের মধুপুরে জুম্মদের ঘরবাড়িতে হামলার চেষ্টা করে। এসময় হাসপাতাল ও শালবন এলাকা থেকে শত শত সেটেলার বাঙালি এসে মধুপুরে হামলার চেষ্টা করে। তবে জুম্মদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ফলে সেটেলার বাঙালিরা এক পর্যায়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

দীঘিনালায় হামলা:

গত ১৯ সেপ্টেম্বর বিকাল ৪:০০ টার দিকে বাঙালি ছাত্র পরিষদের ব্যানারে সেটেলার বাঙালিরা সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে দীঘিনালা উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশের শেষদিকে সেটেলার বাঙালিরা দীঘিনালা সদরে জুম্মদের উপর লাঠিসোটা ও ইটপাটকেল দিয়ে হামলা করে। এ সময় সেটেলার বাঙালিদের নিক্ষিপ্ত ইট-পাটকেল রিপুয়ে চাকমা নামে একজন জুম্মের কপালে আঘাত করে।

এসময় আশেপাশের জুম্মরা "উজো উজো" বলে আক্রান্তদের বাঁচাতে এগিয়ে আসলে সেটেলার বাঙালিরা পিছু হটে। সেটেলার বাঙালিরা যখন পিছু হটতে থাকে তখনি সেনাবাহিনীর একটি দল সেখানে আসে এবং জুম্মদের ধাওয়া করে তাড়িয়ে দেয়। সেনা সদস্যরা জুম্মদেরকে বলে যে, "তোমরা চলে যাও, কিচ্ছু হবে না। আমরা আছি। তোমরা এখানে থাকলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠবে।"

জুম্মরা চলে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরেই সেটেলার বাঙালিরা আবার দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে দীঘিনালা সদরে হামলা চালাতে আসে। এসময় বিকাল আনুমানিক ৫:০০ টার দিকে সেটেলার বাঙালিরা সেনাবাহিনীর চোখের সামনেই বটতলার লারমা স্কোয়ার স্টেশন বাজারে অগ্নিসংযোগ করে। এতে জুম্মদের অন্তত ৫২টি দোকান ও বাড়ি এবং ২৪টি মোটরবাইক ও অটোরিক্সা ভস্মীভূত হয়। এ হামলায় কমপক্ষে ৫ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসময় সেনাবাহিনীকে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

এরপর সেটেলার বাঙালিরা দীঘিনালা সদরের কলেজ টিলা ও বাবু পাড়ায় হামলার চেষ্টা করে। সেসময় জুম্ম গ্রামবাসীরা সংঘবদ্ধ হয়ে সেটেলার বাঙালিদের প্রতিরোধ করে। এভাবে প্রায় রাত ৯:০০ টা পর্যন্ত জুম্মদের উপর সেটেলার বাঙালিরা হামলা ও অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালিয়ে থাকে।

এ হামলায় মাইনী ব্রিজ এলাকায় দীঘিনালা সদরের উদোলবাগানের হান্দারা চাকমার ছেলে ধন রঞ্জন চাকমা (৫২) নামে এক জুম্ম গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ধন রঞ্জন চাকমার হাত ও পায়ের রগ কেটে দেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। দীঘিনালায় সেটেলারদের হামলায় এবং সেনাবাহিনীর লাঠিপেটায় কমপক্ষে ৪ জন জুম্ম আহত হয়।

খাগড়াছড়ি সদরে গুলি বর্ষণ

দীঘিনালায় হামলার প্রতিবাদে এবং জুম্ম গ্রামগুলোর সুরক্ষার জন্য ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা আনুমানিক ৬:৩০ টার দিকে খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভর, নারানখেয্যা এলাকায় একদল আদিবাসী জুম্ম ছাত্র-যুবক জড়ো হতে থাকে। এসময় সেখানে সেনাবাহিনীর একাধিক দল উপস্থিত হয়। এরপর ইউপিডিএফরা গাছবান ও পেরাছড়া থেকে একদল ছাত্র-যুবককে অনন্ত মাষ্টার পাড়ায় পাঠিয়ে দেয়। উক্ত ছাত্র-যুবকদের সাথে সেনাবাহিনী মুখোমুখী হয় এবং সামান্য দূর থেকে উভয়ের মধ্যে বাকবিতন্ডা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

রাত পৌনে ১১:০০ টার দিকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি স্বনির্ভর এলাকার দিকে যাচ্ছিল। পাছবান ও পেরাছড়া থেকে আসা ছাত্র-যুবকরা সেনাবাহিনীর সেই গাড়িটি রাস্তায় অবরোধ করে। সেনাবাহিনীর সাথে বাক-বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। জুম্ম ছাত্ররা কাস্তা-গুলতি ব্যবহার করে। এক পর্যায়ে সেনাবাহিনী সেখানে গুলিবর্ষণ করে। এসময় সেনাবাহিনীর গুলিতে কমপক্ষে ২০ জুম্ম ছাত্র-যুবক আহত হয়। ছাত্রদের কারো কারো পেটে, হাটুতে, পায়ে গুলি লেগে গুরুতর আহত হয়। আহতদের মধ্যে গুরুতর আহত একজনকে চট্টগ্রামে স্থানান্তর করা হয়।

তাদের মধ্যে স্বনির্ভর এলাকায় সেনাবাহিনীর গুলিতে ২ জন নিহত হয়। নিহত ২ ব্যক্তি হলেন- ১. জুনান চাকমা (২০), পীং- রুপায়ন চাকমা, ঠিকানা- জামতলা, খাগড়াছড়ি সদর, তিনি পানছড়ি কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ২. রুবেল ত্রিপুরা (৩০), পিতা: গর্গজ মনি ত্রিপুরা, ঠিকানা- পল্টনজয় পাড়া, পেরাছড়া ইউপি, খাগড়াছড়ি সদর।

রাঙ্গামাটি সদরে হামলা:

২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সকাল ১০:০০ টার দিকে, রাঙ্গামাটি জেলা সদরে সংঘাত ও বৈষম্য বিরোধী পাহাড়ি ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে আদিবাসী জুম্ম ছাত্র-যুবকের উদ্যোগে ১৯ সেপ্টেম্বরের দীঘিনালা-খাগড়াছড়িতে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি রাঙ্গামাটি জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে যখন রাজবাড়ী পেট্রোল পাম্প এলাকায় পৌঁছে, তখন একদল উত্তেজিত মিছিলকারী কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার গাড়ি ভাঙ্গার চেষ্টা করে। মিছিলটি হ্যাপী মোড়ে পৌঁছলে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন বাঙালিকে ধাওয়া করে মিছিলকারীরা। মিছিলটি যখন বনরূপা পেট্রোল পাম্প এলাকায় পৌঁছে, তখন প্রথমে বনরূপা বিলাস বিপনী নামক দোকানের পাশ থেকে এবং পরে দোকানের ছাদ থেকে একজন সেটেলার কর্তৃক পাহাড়ি ছাত্রদের মিছিলে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। এতে মিছিলকারীরা উত্তেজিত হয়ে বাঙালিদের উদ্দেশ্যে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে মিছিলকারী ছাত্রদের সাথে বাঙালিদের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়।

এরপর সেটেলার বাঙালিরা বনরূপায় জুম্মদের বসতবাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। সেটেলার বাঙালিরা সেভরন ও মেডিনেট ক্লিনিকে, বিজন সরণী এলাকায় জুম্মদের বিভিন্ন দোকানপাটে, জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। অন্যদিকে কাঠালতলীস্থ ঐতিহ্যবাহী মৈত্রী বিহারে হামলা ও ভাঙচুর এবং তবলছড়িস্থ আনন্দ বিহারে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। মৈত্রী বিহারের গেইট ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে সেটেলাররা বুদ্ধমূর্তি, আসবাবপত্র ও দানবাক্স ভেঙ্গে ফেলে। মৈত্রী বিহার থেকে ৭টি দানবাক্স, মাসিক চাঁদা ৯০ হাজার টাকা, ১০টি বুদ্ধমূর্তি ও ল্যাপটপ লুট করে নিয়ে যায় সেটেলাররা। আনন্দ বিহারে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে বিহারের জানালার কাঁচ ভেঙ্গে দেয় ও বুদ্ধমূর্তির উপর আঘাত করে। সেটেলার বাঙালিরা হাসপাতাল এলাকা ও টিএন্ডটি এলাকায় জুম্মদের ঘরবাড়িতে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে।

রাঙ্গামাটিতে সেটেলার বাঙালিরা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কার্যালয়ে ও বিশ্রামাগারে হামলা চালিয়ে সরকারি সম্পত্তি ক্ষতিসাধন করে। এসময় হামলাকারীরা আঞ্চলিক পরিষদের ১টি পিকআপ, ৫টি পাজেরো, ব্যক্তিগত ২টি গাড়ি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ১টি পাজেরো ও ১টি পিকআপে অগ্নিসংযোগ করে। এছাড়া আঞ্চলিক পরিষদের বিল্ডিংয়ে অগ্নিসংযোগ করে থাকে। আগুন জ্বলতে থাকার সময় সেনাবাহিনীর একটি দল আঞ্চলিক পরিষদে গেইটে অবস্থান নেয়। এসময় আগুন নেভানোর জন্য ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি আসলে সেটেলাররা আগুন নেভাতে বাধা দেয়। পুড়ে অংগার হয়ে যাওয়ার পরই ফায়ার ব্রিগেডকে আগুন নেভাতে অনুমতি দেয়।

বনরূপা ও কালিন্দীপুরে হামলায় এক জুম্ম যুবক নিহত এবং প্রায় শতাধিক জুম্ম আহত হয়। তন্মধ্যে হাসপাতালে আহত ২৭ জন জুম্ম, রাজবন বিহার হাসপাতালে ২৫ ও ঘরে ঘরে ২৮ জন জুম্ম চিকিৎসা নিয়েছে বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে গুরুতর জখম হওয়ায় ২ জনকে চট্টগ্রামে প্রেরণ করা হয়। মৈত্রী বিহারে ভাঙচুর ও লুটপাটসহ জুম্মদের ২৪টি ঘরবাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও দোকানে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। এতে প্রায় ৫ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে জানা যায়।

নিহত ব্যক্তি হলেন অনিক কুমার চাকমা (১৮), পীং- আদর সেন চাকমা, গ্রাম- নোয়া আদাম, মগবান ইউনিয়ন, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা। তিনি কাপ্তাই কর্ণফুলী সরকারি ডিগ্রি কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক ১ম বর্ষের ছাত্র। তিনি নিউ মার্কেট সংলগ্ন কালিন্দীপুর সড়কে সেটেলার বাঙালিদের হামলায় নিহত হন। তাকে লাঠিসোটা নিয়ে আঘাত করতে করতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। হামলা ও অগ্নিসংযোগের পর রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

উল্লেখ্য যে, সংঘাত ও বৈষম্য বিরোধী পাহাড়ি ছাত্র আন্দোলনের রাঙ্গামাটির মিছিলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফের দুই শতাধিক ছাত্র যুবক অংশগ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে। জেলা শিক্ষা অফিসের সামনে পৌঁছলে অন্যান্য শ্লোগানের সাথে "পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কর, করতে হবে" শ্লোগানটি তুলে ধরলে অধিকাংশ ছাত্র "বাস্তবায়ন কর, করতে হবে" বললেও ইউপিডিএফের সেই ছাত্র-যুবকরা "ভূয়া, ভূয়া" বলে চিৎকার করে। মিছিলটি জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শিল্পকলা একাডেমির কাছে পৌঁছলে সেখান থেকে প্রায় ২০০ জন অপরিচিত ছাত্র-যুবক মিছিলে সামিল হয়, যাদেরকে সংঘাত ও বৈষম্য বিরোধী পাহাড়ি ছাত্র আন্দোলনের সংগঠকরা চিনেন না বলে জানিয়েছেন।

অন্যদিকে মিছিলটি ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয় পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করে আবার জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে ফিরে আসার কথা থাকলেও সেসব অপরিচিত ইউপিডিএফ ছাত্র-যুবকরা জোর করে মিছিলটি বনরূপায় দিকে এগিয়ে নেয়। এরপর হ্যাপী মোড়ে পৌঁছলে সেই যুবকরা বাঙালিদেরকে ধাওয়া করে। অপরদিকে বনরূপায় পেট্রোল পাম্পে মিছিলটি পৌঁছতে না পৌছতেই দোকানের ছাদের উপর থেকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করলে সেসব অপরিচিত ছাত্র-যুবকরা মিছিল থেকে

পাল্টা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতিকে উত্তেজিত করে তোলে।

খাগড়াছড়িতে জুম্ম ছাত্রী ধর্ষণকারী গণপিটুনীতে নিহত, জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা

খাগড়াছড়িতে খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ও সেফটি বিভাগের চিফ ইনস্ট্রাক্টর সোহেল রানা কর্তৃক ৭ম শ্রেণির এক ত্রিপুরা স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করার পর বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের মারধরের ফলে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। গত ১ অক্টোবর ২০২৪ সকাল ৯টার দিকে শিক্ষক সোহেল রানা ৭ম শ্রেণিতে পড়ুয়া ঐ ত্রিপুরা ছাত্রীকে প্রলোভন দেখিয়ে ডেকে নিয়ে তার কোয়ার্টারে নিয়ে যায়। এটা তার সহপাঠীরা দেখে ফেললে কয়েকজন কলেজে উপস্থিত হয়ে অধ্যক্ষের কাছে যায় মেয়েটির খোঁজ নিতে।

পরে সেখানে পুলিশ ও প্রশাসনের লোকজনের উপস্থিতিতে মেয়েটিকে ওই শিক্ষকের রুম থেকে উদ্ধার করা হয়। মেয়েটি জানায় যে, ওই শিক্ষক তাকে আটকে রেখে ধর্ষণ করেছে। তখন বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ওই শিক্ষকের ওপর চড়াও হয় এবং তাকে মারধর করতে শুরু করে। পরবর্তীতে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার মৃত্যু নিশ্চিত করে। এই ঘটনার জের ধরে আনুমানিক দুপুর ২টার দিকে সেটেলার বাঙালিরা আশে-পাশের বিভিন্ন স্থান থেকে একত্রিত হয়ে লাঠিসোটা ও দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে জুম্মদের বিভিন্ন গ্রামে হামলা চালায় এবং জুম্মদের দোকানপাট ও ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়।

এ সময় বাজার থেকে ফেরার পথে দক্ষিণ খবংপুজ্জে আদর্শ বৌদ্ধ বিহারের সেবক উজ্জ্বল মারমাকে সেটেলাররা পিঠে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে। পরে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহত উজ্জ্বল মারমার বাড়ি পানছড়ি উপজেলার লোগাংয়ের উল্টাছড়ি গ্রামে বলে জানা যায়। এছাড়া সেটেলার বাঙালিদের হামলায় আরো ২ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। তারা হলেন- কান্ত মনি চাকমা, সাবেক পৌরসভা কাউন্সিলর, পিতার নাম অরুণ কুমার চাকমা ও শ্যামল কান্তি চাকমা, পিতা-ভুজলাল চাকমা। এছাড়াও, সেটেলার বাঙালিদের হামলায় একজন জুম্ম শিক্ষার্থী চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

অন্যদিকে, সেটেলার বাঙালিরা চেংগ্রাউ পাড়ায় একজন রাখাইনের দোকানে অগ্নিসংযোগ করে। এতে দোকানে থাকা বুদ্ধমুর্তি ও অন্যান্য মালামাল পুড়ে যায়। এছাড়াও সেটেলার বাঙালিরা, মধুপুর, কল্যাণপুর, পানখাইয়া পাড়া, কলেজ গেইট, স্লুইস গেইট সহ পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলে হামলার চেষ্টা করে। এ হামলায় জুম্মদের কমপক্ষে ২৮টি দোকানপাট ও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শেষ কথা:

পার্বত্য চট্টগ্রামে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা নতুন কিছু নয়। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিশেষ মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় এবারের সাম্প্রদায়িক হামলাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে ২১টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। এ ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা এবং সে লক্ষ্যে জুম্মদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা, জুম্মদের ভূমি জবরদখল করা, তাদের চিরায়ত জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ করা, সর্বোপরি জুম্মদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করা।

এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ২০শে সেপ্টেম্বর আইএসপিআরের দেয়া বিবৃতিতে "খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে চলমান উত্তেজনা তিন পার্বত্য জেলায় ভয়াবহ দাঙ্গায় রূপ নিতে পারে" বলে বলা হয়েছে। আইএসপিআরের এই বক্তব্য অনেকটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগাম প্রচারণার সামিল, যা দাঙ্গাকারীদের দাঙ্গা সংঘটনে উস্কে দেয়ার ষড়যন্ত্র বলে বিবেচনা করা হয়। আইএসপিআরের মতো একটি দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ এভাবে কখনোই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগাম প্রচারণা চালাতে পারে না। এটা অনেকটা মানুষের মনে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টির সামিল বলে গণ্য করা যেতে পারে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রকৃত রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের ক্ষেত্রে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্যেই পার্বত্য সমস্যার সমাধানের সূত্র নিহিত রয়েছে।

সাম্প্রদায়িক হামলার বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে প্রতিবাদ ও নিন্দা

দেশে:

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ও ২০ সেপ্টেম্বর, যথাক্রমে খাগড়াছড়িতে ও রাঙ্গামাটিতে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) নাম জড়িয়ে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ আইএসপিআর এক বিবৃতি প্রকাশ করে। আইএসপিআরের উক্ত বিবৃতিতে রাঙ্গামাটিতে সাধারণ জুম্ম শিক্ষার্থীদের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এর উপর দায় চাপিয়ে দেয়ার হীন চেষ্টা চালানো হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে দুই দিনব্যাপী সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলা ও আইএসপিআর এর বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। পিসিপির প্রতিবাদে বলা হয় যে, আইএসপিআরের বক্তব্য সাম্প্রদায়িক, দায়িত্বহীন, একপেশে ও উস্কানিমূলক। উক্ত কর্মসূচিতে পিসিপি'র কোন সম্পৃক্ততা ছিল না। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার হীন উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা সংগঠিত করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করার জন্য সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর অপতৎপরতায় এধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা সংগঠিত হচ্ছে বলে পিসিপি মনে করে। দুই দিনব্যাপী সংঘটিত ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় নিয়ে এসে শাস্তি প্রদানসহ অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ।

রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনী ও সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্ম হত্যা, বৌদ্ধ বিহারে হামলা ও ভাংচুর, জুম্মদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের প্রতিবাদে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় থানছি উপজেলা সদরে 'থানছি আদিবাসী ছাত্র ও যুব সমাজ'- এর ব্যানারে বান্দরবানের থানছিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে।

দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে সেটেলার কর্তৃক নিরীহ আদিবাসী পাহাড়িদের উপর হামলা, মন্দির, দোকান ও বাড়িঘরে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং সেনাবাহিনীর গুলিতে তিন পাহাড়ি নিহত হওয়ার প্রতিবাদে এবং জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রদীপ প্রজ্বলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সন্ধ্যায় কক্সবাজারের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিক্ষুব্ধ আদিবাসী ছাত্র-জনতার ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। পার্বত্য তিন জেলায় দমন-নিপীড়ন বন্ধের দাবিতে এই বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রদীপ প্রজ্বলন আয়োজন করেন কক্সবাজারের আদিবাসী ছাত্র-জনতা। এসময় তারা পাহাড়ে দমন-নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে এবং মানুষকে বাঁচার মতো বাঁচতে দিতে জোর দাবি জানান। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, কক্সবাজার আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মং থেন হ্লা রাখাইন, সুফল চাকমা, মা টিন টিনসহ সিপিবি কক্সবাজার জেলা সদস্য জনাব করিম প্রমুখ।

গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কাপেইং ফাউন্ডেশনের এক রিপোর্টে বলা হয় যে, আদিবাসীদের উপর সংঘটিত পার্বত্য চট্টগ্রামের দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে সাম্প্রদায়িক হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনায় ৪ জন নিহত হয়েছে এবং অনেক আহত হয়েছে।

বৌদ্ধ বিহার ভাঙচুর ও লুটপাট এবং রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে সংঘটিত সহিংস ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের পরামর্শ দিয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ বাংলাদেশ। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ বাংলাদেশ এর সভাপতি শ্রদ্ধালংকার মহাথের স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত পরামর্শসহ ৫ দফা পরামর্শ জানানো হয়েছে।

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঢাকার শাহবাগে সম্প্রতি খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে পাহাড়িদের উপর গুলিবর্ষণ, হত্যা, ঘরবাড়ি, দোকানপাট, ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে নিয়োজিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি প্লাটফর্ম 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন'। মানবাধিকার কর্মী দীপায়ন খীসার সঞ্চালনায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেন এর সভাপতিত্বে এই সমাবেশে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. খায়রুল ইসলাম চৌধুরী। সমাবেশে সংহতি বক্তব্য রাখেন সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের কার্যকরী সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, বাংলাদেশ জাসদ এর সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সাংসদ নাজমুল হক প্রধান, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর সহকারী সাধারণ সম্পাদক খায়রুজ্জামান লিপন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলম প্রমুখ।

বিদেশে:

গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন ও ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ অন ইন্ডিজেনাস অ্যাফেয়ার্স (ইবগিয়া) বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্ম জনগণের উপর সহিংস আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি যৌথ বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি, সহিংস আক্রমণের বিষয়ে জাতিসংঘের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন এবং 'অপারেশন উত্তরণ' সম্পর্কিত নির্বাহী আদেশ প্রত্যাহার, ১৯৯৭ সালে চুক্তির প্রবিধান অনুযায়ী ছয়টি সেনানিবাস বাদে পার্বত্য চট্টগ্রামের সব সামরিক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প তুলে নেওয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেটেলারদের মর্যাদাপূর্ণ পুনর্বাসনের পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

দিঘিনালা, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে সংঘটিত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও নিরপেক্ষ কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছে সিএইচটি* ইন্ডিজেনাস পিপলস কাউন্সিল অব কানাডা। গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে টরন্টোতে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের মাধ্যমে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ইউনূসের কাছে পেশকৃত স্মারকলিপিতে এ দাবি জানানো হয়।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে আমেরিকান জুম্ম কাউন্সিল পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা-রাঙামাটিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় বহিরাহত সেটেলাররা জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠী এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি শিক্ষার্থী দিনালো চাকমা, চঞ্চনা চাকমা, সুশীল চাকমা, মং এ প্রু, মনোজিৎ চাকমা এবং অর্ণব দেওয়ান প্রমুখ। এই সমাবেশের পর আমেরিকান জুম্ম কাউন্সিল জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি মুহাম্মদ আবদুল মুহিতের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে। এছাড়া জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার মি: ভলকার টার্কের কাছেও একটি পৃথক স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে।

জুম্ম বুড্ডিস্ট কালচারাল সেন্টার অফ কানাডা এর উদ্যোগে কানাডার রিজাইনায় এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশটি পরিচালনা করেন বিপাশা চাকমা। সমাবেশ শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে এক স্মারকলিপি দেয়া হয়।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ রোজ বুধবার, দুপুর ২:০০ টায় ফ্রান্সে বসবাসরত জুম্ম আদিবাসীদের সংগঠন La voix des Jumma (LVJ) ও ইউরোপিয়ান জুম্ম ইন্ডিজিনাস কাউন্সিল এর যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ভিজ্যুয়াল আর্টিস্ট তুফান চাকমা'র ডিজাইনকৃত ব্যানারে, যার মূল শ্লোগান 'বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্ম জনগণের প্রতি সহিংসতা ও হত্যার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধতা' এবং 'আমরা শান্তি, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্র চাই, রক্তপাত নয়' এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক-এর উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রোনেল চাকমা ননি, কোরিয়ান হাইস ফর ইন্টারন্যাশনাল সলিডারিটি চৈ মিক্যং, দ্যা রিফিউজি প্লেম লি জিনহা, ইয়াগ্যক বৌদ্ধ বিহারের শরণা লঙ্কার মহাথেরো, সমাপ্তি চাকমা, জিকো চাকমা, জেকি মারমা, বুড্ডিষ্ট এথিকস এন্ড পলিসির সন সাং, দিপন চাকমা, কেয়া মনি চাকমা, জনক দেওয়ান, ফরটি চাকমা। সমাবেশ শেষে সিউলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নিকট চারটি দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

গত ১লা অক্টোবর ২০২৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সিএইচটি আমেরিকান জুম্ম পিপলস এসোসিয়েশন ও করুণা বুড্ডিষ্ট সোসাইটি কর্তৃক লস এঞ্জেলেসের সিএনএন ভবনের সামনে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে। এতে অরূপ বিজয় চাকমা, দেবাশীষ চাকমা বাবলু, জুম্ম ভাগ্যবান চাকমা, সৌরভ চাকমা, শুভানন্দ পুরি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

গত ৮ অক্টোবর ২০২৪ মঙ্গলবার তিনটি মানবাধিকার সংগঠন এক যৌথ বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ওপর চলমান সহিংসতা ও হামলায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এশিয়া ইন্ডিজেনাস পিপলস্ প্যাক্ট (এআইপিপি), পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন (সিএইচটিসি) ও ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইনডিজিনাস অ্যাফেয়ার্স (ইবগিয়া)।

গত ১৪ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে প্রকাশিত এক যৌথ বিবৃতিতে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সহিংসতার খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আদিবাসী বিষয়ক জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামের চেয়ারপারসন হিন্দো ওমারো ইব্রাহিম এবং আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়র জোসে ফ্রান্সিসকো ক্যালি জেই। জুম্ম জনগণকে নির্বিচার সহিংস হামলা থেকে

রক্ষা, সহিংসতার বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন পরিচালনা এবং অবিলম্বে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে পার্মানেন্ট ফোরাম ও স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার।

১৯ অক্টোবর ২০২৪ লন্ডনের পার্লামেন্ট স্কোয়ারে জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক ইউকে, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল এবং ফ্রেন্ডস অফ সিএইচটি-এর উদ্যোগে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদের দ্বারা আদিবাসী জুম্ম জনগণের উপর সাম্প্রতিক সহিংস সাম্প্রদায়িক হামলার বিরুদ্ধে একটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন উজ্জয়িনী রায়, জেরেমি অ্যালেন, ওমবাশি গ্রেচ ক্যাটো, রুমানা হাশিম ও নোয়েল হিউম। সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনালের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার সোফি গ্রিগ বিক্ষোভে অংশ নিতে পারেননি, উজ্জয়িনী রায় তার বক্তব্য পড়ে শোনান। বিক্ষোভের শেষে, উজ্জয়িনী রায়, জেরেমি অ্যালেন, ধর্মপ্রিয় শ্রমণ, ওমবাশি গ্রেচ ক্যাটো এবং ভ্যালেন্টাইন হার্ডিং ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন, জাপানের টোকিও শহরেও প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অন্যদিকে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সকালের দিকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে ব্যাপক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়। তাদের মধ্যে ত্রিপুরা ভিক্ষু সংঘ অভয়নগরস্থ বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনের কার্যালয়ের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, তারপর আস্তাবল এলাকার স্বামী বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে গিয়ে জমায়েতে অংশ নেয়। সেখানে আগে থেকে আরও বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মী ও আদিবাসী নারী-পুরুষরা জমায়েত হতে থাকেন। পরে বিক্ষোভকারীরা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে বিভিন্ন শ্লোগান ও দাবি-দাওয়া সম্বলিত ব্যানার, প্ল্যাকার্ড নিয়ে একটি মিছিল বের করে এবং আগরতলার প্রধান প্রধান সড়কসমূহ প্রদক্ষিণ করে। বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহ হল ত্রিপুরা চাকমা স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন (টিসিএসএ), ত্রিপুরা গাবুজ্যা জধা, ত্রিপুরা ভিক্ষু সংঘ, ত্রিপুরা চাকমা মিলে জধা, ত্রিপুরা রেজ্য চাকমা সামাজিক পরিষদ, ত্রিপুরা ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফেডারেশন (টিআএসএফ), মগ স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন, ইয়থ তিপ্রা ফেডারেশন (ওয়াইটিএফ)।

২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মিজোরাম রাজ্যের চাকমা অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের কমলানগর থেকেও সেন্ট্রাল ইয়াং চাকমা এসোসিয়েশন (সিওয়াইসিএস) খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে আদিবাসী জুম্মদের উপর হামলার নিন্দা জানিয়ে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে।

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ভারতের মিজোরাম রাজ্যের চাকমা স্বশাসিত জেলা পরিষদের (সিএডিসি) রাজধানী কমলানগর এবং অন্যতম শহর লংপুইঘাট-এ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে সেনা সহায়তায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। 'চাকমা'স অফ মিজোরাম'-এই ব্যানারে সকাল ১১:০০ টায় শুরু হওয়া কমলানগরের সমাবেশে প্রায় ২-৩ হাজার লোকের সমাগম হয়। সমাবেশে কমলানগরের লুম্বিনী বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ কুশলানন্দ থের, ইয়ং চাকমা এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. জ্যোতি বিকাশ চাকমা, সাবেক চাকমা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য অমর স্মৃতি চাকমা এবং সাবেক বিধায়ক (এমএলএ) ডা. বুদ্ধধন চাকমা বক্তব্য প্রদান করেন। সমাবেশের শেষে কমলানগর সাবডিভিশনাল অফিসারের মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বরাবর একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

অল আসাম চাকমা সোসাইটি (এএসিএস), গোহাটি চাকমা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (জিসিএসইউ) এবং অল বোড়ো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আবসু) ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সংখ্যালঘুদেরকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট অবৈধভাবে বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদের পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক আক্রমণ থেকে বাঁচাতে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে একটি জরুরি আবেদন পেশ করেছে।

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটিসহ বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় অবৈধ মুসলিম সেটেলারদের দ্বারা জুম্মদের উপর হামলা, হত্যা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করার প্রতিবাদে দিল্লী চাকমা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (ডিসিএসইউ) কর্তৃক প্রতিবাদ সমাবেশ ডাকা হয়। সমাবেশ শেষে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এস জয়শংকর এর বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

পরিতোষ চাকমা এবং ডিসিএসইউ-এর জেনারেল সেক্রেটারি তুষিত চাকমার নেতৃত্বে প্রতিবাদ সমাবেশটি পরিচালিত হয়। আর অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন জেএনইউ-এর প্রাক্তন প্রফেসর ও দিল্লী সাংবাদিক ফোরামের সম্পাদক ডক্টর সুবোধ কুমার এবং বক্তব্য রাখেন আরএসএস-এর কেন্দ্রীয় প্রচারক ডক্টর কৃষ্ণ দয়াল জমাতিয়া, দার্জিলিং গোর্খাল্যান্ডের নেতা এডভোকেট প্রমোদ ছেত্রী, বিজেপি কেন্দ্রীয় সদস্য এবং নর্থ-ইস্ট সেলের প্রধান মিসেস খুলনা লাইমায়ুম, পিস ক্যাম্পেইন গ্রুপ (পিসিজি)-এর প্রেসিডেন্ট করুনালংকার ভিক্ষু, ডিসিএসইউ-এর প্রেসিডেন্ট মিস মিলনী চাকমা, ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিপুল চাকমা, মিজোরাম মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট মন্দিরা চাকমা এবং উত্তম চাকমা বক্তব্য রাখেন।

ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট এট্রোসিটিস অন মাইনরিটিজ ইন বাংলাদেশ (কাম্ব) এবং অল ইন্ডিয়া রিফিউজি ফ্রন্ট (এআইআরএফ) বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর সংঘবদ্ধ নির্যাতনের তীব্র নিন্দা জানায় এবং শাহরিয়ার কবিরের মতো প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও মানবাধিকার কর্মীদের প্রতি পুলিশ কর্তৃক অমানবিক আচরণের তীব্র নিন্দা জানায় এবং একটি সংবাদ সম্মেলন ও একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রানা দাশগুপ্ত ও অন্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করার প্রতিবাদ জানানো হয়। গত (২৫ সেপ্টেম্বর) কলকাতার প্রেসক্লাবে এই সাংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করেন মোহিত রায়, সুজিত শিকদার, প্রকাশ দাস, চয়ন রায়, রঞ্জিত মন্ডল, রাখাল পাল, জগদীশ হালদার, কে এন মন্ডল, সুজাতা মজুমদার, অ্যাডভোকেট শংকর দাস, দিলীপ মজুমদার, পার্থ বণিক, সুকুমার শিকদার, খোকন বিশ্বাস প্রমুখ।

গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাব্রুম শহরে আদিবাসী সহ সকল সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে এক বিরাট ধিক্কার মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে শুধু জনজাতির লোকজন নয়, হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরও ব্যাপক সমাবেশ ঘটে। সমাবেশে মহারাজা ও তিপ্রা মথার সভাপতি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ-সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবন্দ বক্তব্য রাখেন।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাব্রুম শহরে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চাকমা ও মগ সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে সম্প্রতি বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলায় আদিবাসী জুম্ম জাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর হামলা, হত্যা, বাড়ি ও দোকানে অগ্নিসংযোগ এবং বৌদ্ধ বিহারে হামলা, লুটপাট ও ভাঙচুর এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের উপর হামলার প্রতিবাদে এক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিছিল শেষে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বরাবরে একটি স্মারকলিপিও প্রেরণ করা হয়েছে।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, বিকাল ৪ টার দিকে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদ কর্তৃক বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনজাতিদের উপর হামলার প্রতিবাদে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে উক্ত ঘটনার আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে ঘটনায় জড়িতদের বিচারের দাবিও জানানো হয়েছে।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, রবিবার, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় বাংলাদেশে একের পর এক সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় ও আদিবাসী জনগণের উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণের প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন পেশার বিশিষ্টজন ও বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণে এক মহামিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই মহামিছিলের আয়োজন করে নবগঠিত একটি সংগঠন 'ফোরাম ফর প্রোটেকশন অব মাইনোরিটিস ইন বাংলাদেশ'। জানা গেছে, যতদিন প্রতিবেশি দেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার চালানো হবে, এই সংগঠনও ততোদিন তার আন্দোলন জারী রাখবে এবং সারাদেশে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেবে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

> 'আমাদের দাবি ন্যায়সঙ্গত দাবি। বছরকে বছর ধরে ইহা একটি অবহেলিত শাসিত অঞ্চল ছিল। এখন আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামকে গণতান্ত্রিক পৃথক শাসিত অঞ্চল অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বাস্তবে পেতে চাই।'
>
> *—মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

সংবাদ প্রবাহ

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

রোয়াংছড়িতে সেনাবাহিনীর মারধরের শিকার এক আদিবাসী যুবক

বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক আদিবাসী নিরীহ যুবক মারধর ও সাময়িক আটকের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভুক্তভোগী ওই আদিবাসী যুবকের নাম ডানিএং খুমী (২২), পীং-সিমাইন খুমী, গ্রাম- প্রোফুংমক পাড়া, ২নং ওয়ার্ড, ২নং রুমা সদর ইউনিয়ন, রুমা উপজেলা। তিনি পেশায় একজন বাইক চালক বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৬ জুলাই সকাল ১১ টার দিকে ডানিএং খুমী তার বাইকে করে ভাড়ায় এক আদিবাসী স্কুল ছাত্র ও তার অভিভাবককে নিয়ে রুমা থেকে রোয়াংছড়ি উপজেলার পাকলাছড়া ছাত্রাবাসের উদ্দেশে রওনা দেন। যাওয়ার পথে খামতাম পাড়া গ্রামের পরই রোয়াংছড়ি সেনা ক্যাম্পের অধীন একটি সেনা চেক পোস্টে সেনা সদস্যদের কর্তৃক বাইকটি থামানো হয়। সেখানে কোনো কিছু না বলেই সেনা সদস্যরা বাইক চালক ডানিএং খুমীকে ব্যাপক মারধর করে। পরে সেনা চেক পোস্টে প্রায় ৬/৭ ঘন্টা আটকাবস্থায় রাখার পর বিকাল ৬ টার দিকে সেনা সদস্যরা বাইক চালক ডানিএং খুমীকে ছেড়ে দেয়।

রুমায় সেনাবাহিনীর নিষেধাজ্ঞায় বমদের কয়েক লক্ষ টাকার আনারস ক্ষতিগ্রস্ত

সেনাবাহিনীর নিষেধাজ্ঞার কারণে বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার আদিবাসী বম জনগোষ্ঠীর কয়েক লক্ষ টাকার বিক্রিত ও বিক্রয়যোগ্য পাকা আনারস ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। গত ১০ জুলাই ২০২৪ কেবল বাজারে পঁচে যাওয়া কয়েক লক্ষ টাকার আনারস এর মালিকরা রুমা বাজারের পার্শ্ববর্তী পলি পাড়া সংলগ্ন এক ঝিঁড়িতে অনন্যোপায় হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সম্প্রতি আনারসের মৌসুমে অনেক বম গ্রামবাসী বিক্রির জন্য রুমা বাজারে আনারস আনেন। অনেক আনারস বাঙালি ও পাহাড়ি ব্যবসায়ীরা ক্রয় করে বাজারে মজুত করে ট্রাকে বোঝাই করেন। পরে রুমা সেনা ক্যাম্প থেকে এএসইউ (আর্মি সিকিউরিটি ইউনিট)-এর একদল সদস্য এসে বমদের ঐ আনারস কেউ বাজার থেকে কোথাও নিয়ে যেতে বা বিক্রি করতে পারবে না বলে জানিয়ে দেয়। এই অবস্থায় আনারসগুলো পঁচতে শুরু করলে মালিকরা সেগুলো ঝিঁড়িতে ফেলে দেন। আরও অনেক বম গ্রামবাসীর লক্ষ লক্ষ টাকার আনারস বাগানেই পঁচে গেছে বলে জানা গেছে।

সেনাবাহিনীর নিষেধাজ্ঞার কারণে ইতিপূর্বেও একাধিকবার সাধারণ বম গ্রামবাসীরা আম, কাঠাল সহ বিভিন্ন ফল ও সবজি বিক্রি করতে না পেরে আর্থিকভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনিতেই অনেক গ্রামবাসী সেনাবাহিনী ও কেএনএফের নিপীড়ন ও হয়রানির ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং আত্মীয়-স্বজনের বাড়িয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

বান্দরবানে যৌথবাহিনী কর্তৃক আরও ৫ বম গ্রামবাসী গ্রেপ্তার

যৌথবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) বিরোধী অভিযানে বান্দরবান জেলার রুমা থেকে আরও ৫ বম গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত (১২ জুলাই) গ্রেপ্তারকৃতদের বান্দরবান চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাদের বান্দরবান জেলা কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। যৌথবাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তারকৃতদের কেএনএফ সদস্য হিসেবে প্রচার করা হলেও, ভুক্তভোগীরা প্রকৃতপক্ষে নিরীহ গ্রামবাসী বলে স্থানীয় একটি সূত্র জানিয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা হলেন– লালচন সাং বম (৪৮), লাল সিয়াম থাং বম (৩৮), লাল পিয়ান সাং বম (৩৬), লালহিম সাং বম (৩৭) ও সং লিয়ান বম (২৫)। তারা সকলেই রুমা সদর উপজেলার লাইরুনপি পাড়া গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। জানা গেছে, যৌথবাহিনী প্রকৃতপক্ষে গত ৮ জুলাই উক্ত গ্রামবাসীদের আটক করলেও গত বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) আটক করেছে বলে মিথ্যা প্রচার করে।

হত্যা মামলায় নানিয়ারচর উপজেলা চেয়ারম্যানকে কারাগারে প্রেরণ

মিথ্যাভাবে সাজানো চারটি হত্যা মামলা ও একটি বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় রাঙ্গামাটি জেলা ও দায়রা জজ আদালতে জামিন চাইতে এসে রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অমর জীবন চাকমাকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

গত ২৮ জুলাই ২০২৪ দুপুরের দিকে হাইকোর্টের নির্দেশে নানিয়ারচর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অমর জীবন চাকমা রাঙ্গামাটি জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন জানান। কিন্তু আদালতের বিচারক সহিদুল ইসলাম জামিন নাকচ করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চেয়ারম্যান অমর জীবন চাকমার বিরুদ্ধে ২০০৭ সালে মিথ্যাভাবে ৫০০ টাকার ১০১টি জাল নোট রাখার অপরাধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দায়ের করা হয়। পরে ২০১৮ সালেও সেনা মদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) কর্মী শান্ত চাকমা হত্যা, লংগদুতে জংগলী চাকমা হত্যা, নানিয়ারচরে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও সংস্কারপন্থী দলের নেতা শক্তিমান চাকমা ও কালোময় চাকমা হত্যা মামলার আসামী করা হয় তাকে।

খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রাফীটি অংকনকারী এক জুম্ম ছাত্র আটক, পরে মুক্তি

সারাদেশের ন্যায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরেও গত ১২ আগস্ট ২০২৪ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীরা খাগড়াছড়ি কলেজ ফটকের দেয়ালে গ্রাফীটি অংকনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। একইদিন চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানের জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীরাও স্ব স্ব এলাকায় এই গ্রাফীটি অংকনে অংশগ্রহণ করে।

কিন্তু ১২ আগস্ট বিকেল ৪টার দিকে খাগড়াছড়ি কলেজের দেয়ালে জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রাফীটি অংকন শুরু করলে সেখানে গাড়িতে করে সেনাবাহিনীর একটি দল আসে। এসেই তারা ছাত্র-ছাত্রীদের রং-তুলি ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং কাজে বাধা দেয়। বিশেষ করে সেনাবাহিনীর নামে কোনো কিছু লেখা যাবে না বলে জানায়। ছাত্র-ছাত্রীরা লে: ফেরদৌস কর্তৃক কল্পনা চাকমা অপহরণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাশাসন প্রত্যাহার করার কথা লিখতে চেষ্টা করছিল বলে জানা যায়।

এক পর্যায়ে সেনা সদস্যরা খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র প্রণয় চাকমাকে (১৫) জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। এসময় সেনা সদস্যরা কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে বলেও জানা যায়। এর পরপরই ছাত্র-ছাত্রীরা উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে ঘটনাস্থলে জমায়েত হয়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। প্রায় এক ঘন্টা আটক রাখার পর ছাত্র-জনতার প্রতিবাদের চাপে সেনাবাহিনী আটককৃত প্রণয় চাকমাকে ছেড়ে দেয় বলে জানা যায়।

বান্দরবানে কেএনএফ ও জঙ্গী বিরোধী অভিযানের নামে ১৭টি নতুন ক্যাম্প স্থাপন

বমপার্টি খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) ও ইসলামী জঙ্গী বিরোধী অপারেশনের অজুহাতে বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি, রুমা ও থানচি উপজেলায় সেনাবাহিনীর ১৬টি ও বিজিবির ১টি নতুন অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে, ২০২২ সালের ৩ অক্টোবর থেকে 'জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া' নামক সশস্ত্র ইসলামী জঙ্গী এবং জঙ্গীদের আশ্রয়দাতা বমপার্টি খ্যাত কেএনএফ-এর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) কর্তৃক অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে সেনাবাহিনী এই ক্যাম্পগুলো স্থাপন শুরু করে।

এরপর ২-৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ রুমা ও থানচিতে কেএনএফ কর্তৃক ব্যাংক ডাকাতি ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ১৪টি অস্ত্র লুটের ঘটনার পর সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথবাহিনী কর্তৃক কেএনএফের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে অধিকাংশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এ ধরনের ক্যাম্প স্থাপন ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সরাসরি বরখেলাপ।

উল্লেখ্য যে, সেনাবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৮ সালে নাথান লনচেও বম ও ভাংচুনলিয়ান বমের নেতৃত্বে কুকি-চিন ন্যাশনাল ডেভেলাপমেন্ট অর্গানাইজেশন (কেএনডিও) গঠিত হয়। পরে সেনাবাহিনীর মদদে ২০১৯ সালে কেএনএফ নামকরণ করে সশস্ত্র গ্রুপ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।

এরপর অর্থের বিনিময়ে জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া নামে একটি ইসলামী জঙ্গী সংগঠনকে আশ্রয় ও সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করে কেএনএফ। এই তথ্য প্রকাশ হলে পরে আন্তর্জাতিক চাপে পড়ে সরকার সেনাবাহিনী ও র‍্যাব কর্তৃক কেএনএফ ও ইসলামী জঙ্গীদের বিরুদ্ধে অপারেশন চালাতে বাধ্য হয়।

গত এপ্রিলে কেএনএফ কর্তৃক ব্যাংক ডাকাতি ও অস্ত্র লুটের ঘটনার পর যৌথবাহিনী কেএনএফের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করে। এই অপারেশনের দোহাই দিয়ে বিজিবির ১টি ক্যাম্পসহ সেনাবাহিনী নিম্নোক্ত ১৭টি ক্যাম্প স্থাপন করে। যে ১৬টি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়, সেগুলো হল–

১. রামজু পাহাড়, রোয়াংছড়ি সদর ইউপি, রোয়াংছড়ি। ২. দেবতা পাহাড়, রোয়াংছড়ি সদর ইউপি, রোয়াংছড়ি। ৩. কাটা পাহাড়, রোয়াংছড়ি সদর ইউপি, রোয়াংছড়ি। ৪. মুয়ালপি পাড়া, পাইন্দু ইউপি, রুমা। ৫. বেথেল পাড়া, রুমা সদর, রুমা। ৬. লাইরুনপি পাড়া, রুমা সদর ইউপি, রুমা। ৭.

চইক্ষ্যং বিজিবি ক্যাম্প, রেমাক্রি প্রাংসা ইউপি, রুমা। ৮. তামলৌ পাড়া, রেমাক্রি প্রাংসা ইউপি, রুমা। ৯. সিলৌপি পাড়া, রেমাক্রি প্রাংসা ইউপি, রুমা। ১০. থাইক্ষ্যং পাড়া, রেমাক্রি প্রাংসা ইউপি, রুমা। ১১. দুলাচান পাড়া, রেমাক্রি, থানচি। ১২. রেমন পাড়া ৪২ কিলো, তিন্দু ইউনিয়ন, থানচি। ১৩. ১৯-কিলো এলাকা, থানচি সদর ইউপি, থানচি। ১৪. ২২-কিলো ক্যাম্প, থানচি সদর ইউপি, থানচি। ১৫. ৩০-কিলো ক্যাম্প, থানচি সদর ইউপি, থানচি। ১৬. সাহাজান পাড়া ক্যাম্প (প্রক্রিয়াধীন), থানচি সদর ইউপি, থানচি। ১৭. রামেত্তং পাহাড়, রুমা, রোয়াংছড়ি ও বিলাইছড়ি সীমান্তবর্তী পাহাড়।

সাজেকে জুম্মর ভূমি বেদখল করে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের অভিযোগ

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নে স্থানীয় আদিবাসী জুম্মদের ভূমি বেদখল করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর ক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ২৬ আগস্ট ২০২৪ স্থানীয় বিজিবির জনৈক কমান্ডার স্থানীয় জুম্ম মুরুব্বিদের ডেকে এই ক্যাম্প স্থাপনের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাজেকের ছোট কংলাক এলাকায় বর্তমানে বিজিবি'র একটি অস্থায়ী ক্যাম্প রয়েছে। সম্প্রতি সেই ক্যাম্পটি গুটিয়ে ছোট কংলাক ও শান্তিময় আদাম এর মধ্যবর্তী স্থান দুরহাবা ছড়ায় স্থাপন করার জন্য মারিশ্যা জোন থেকে বিজিবি'র একদল সদস্য সেখানে পরিদর্শনে যান। বিজিবি সদস্যরা ইতোমধ্যে সেখানে ৫ একর পরিমাণ জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করে। জানা গেছে, উক্ত স্থানে অন্তত ৭ জুম্ম পরিবারের মালিকানা রয়েছে এবং তারা কিছু ফলজ চারাও রোপণ করেছেন। ইতিমধ্যে বিজিবি সদস্যরা কিছু চারা গাছ কেটে দিলে মালিকরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

উক্ত স্থানে ক্যাম্প স্থাপিত হলে যে ৭ পরিবার সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তারা হলেন– ১। রিতন চাকমা (৩৫), পিতা-তরুণী সেন চাকমা, ২। সুনীতি রঞ্জন চাকমা (৩৭), পিতা-সমর বিজয় চাকমা, ৩। লক্ষীরঞ্জন চাকমা (২৮), পিতা-সমর বিজয় চাকমা, ৪। পলক চাকমা (৪২), পিতা-বিজয় চাকমা, ৫। বিজয় চাকমা (৬০), ৬। সুকেন চাকমা (৪৫), পিতা-জ্যোতিষময় চাকমা ও ৭। রেমমইয়া চাকমা (৫১), পিতা-নাগররান চাকমা।

জুরাছড়িতে পুলিশের উপর সেনাবাহিনীর হামলা, থানায় অগ্নিসংযোগ

গত ২৭ আগস্ট ২০২৪ রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলা সদরে জোন কমান্ডারের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সদস্যদের কর্তৃক পুলিশের উপর হামলা, জনসাধারণকে মিছিল করতে বাধ্য করা এবং সশস্ত্রভাবে থানায় আক্রমণ, থানাসহ দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা যে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান সেনাশাসনেরই এক নগ্ন ও জ্বলন্ত প্রমাণ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ২৭ আগস্ট বিকাল ৫ টার দিকে জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া সেনা জোনের জোন কমান্ডার জুলফিকলী আরমান বিখ্যাত তার দুই সৈনিক নিয়ে সাদা পোশাকে উপজেলা সদরে হাঁটতে বের হন। হাঁটতে হাঁটতে তারা জুরাছড়ি থানার সামনের পথ দিয়ে হেঁটে যান। এসময় থানার সামনে পথের পাশে থাকা একটি চায়ের দোকানে বসে অন্যান্যদের সাথে চা খেতে খেতে গল্পগুজব করছিলেন তিন চাকমা পুলিশ সদস্য।

জোন কমান্ডার চায়ের দোকানটি অতিক্রম করার পরপরই জোন কমান্ডারের সাথে থাকা রানার হিসেবে পরিচিত সার্জেন্ট মঞ্জু পেছনে ফিরে চায়ের দোকানে প্রবেশ করে জোন কমান্ডারকে কেন সালাম দেয়নি- এই অভিযোগ তুলে তিন চাকমা পুলিশ সদস্যকে থাপ্পর ও ঘুষি মারতে থাকে। এক পর্যায়ে সেনা সদস্যের আচমকা আক্রমণে হতবুদ্ধি পুলিশরাও সেনা সদস্যের সাথে হাতাহাতি করে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে হাতাহাতি থামিয়ে সেনা সদস্য উপজেলা সদরের যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্পে এবং পুলিশ সদস্যরাও থানায় ফিরে যায়।

এর কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যা আনুমানিক ৬ টার দিকে জোন কমান্ডার জুলফিকলী আরমান বিখ্যাত এর নেতৃত্বে ২০-২৫ জনের একটি সেনাদল যুদ্ধংদেহী ভঙ্গীতে অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠি-সোটা নিয়ে থানার দিকে ছুটে আসে। থানার উঠোনে পৌঁছেই সেনা সদস্যরা প্রথমে আকাশের দিকে এক রাউন্ড এবং এরপর মাটিতে দুই রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে থানার ভেতরে প্রবেশ করে যাকে যেখানে পেয়েছে সেখানে নির্বিচারে সকল পুলিশকে লাঠিসোটা ও কিল-ঘুষি দিয়ে মারধর করে। এদের মধ্যে স্বয়ং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তিন চাকমা পুলিশ সদস্য সবচেয়ে বেশি মারধরের শিকার হন। কোনো কোনো পুলিশ যে যেদিকে পারে পালিয়ে যান।

শুধু তাই নয়, থানায় পুলিশ সদস্যদের হামলার পাশাপাশি একই সময়ে সেনাবাহিনী থানার পার্শ্ববর্তী বাজার ও বসতির দোকানদার ও পাহাড়ি-বাঙালি জনসাধারণকে পুলিশের দুর্নীতি

ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে তাৎক্ষণিকভাবে মিছিল করতে বাধ্য করে। একই সাথে সন্ধ্যা আনুমানিক ৬:৩০ টা-৭ টার দিকে সেনা সদস্যরা নিজেরাই থানায় অগ্নিসংযোগ করে এবং থানার একটি সরকারি গাড়ি, থানার সামনে থাকা কয়েকটি চায়ের ও মুদির দোকান জ্বালিয়ে দেয়। পরে সেনাবাহিনী 'বিক্ষুব্ধ জনতা পুড়িয়ে দিয়েছে'- এমন প্রচার করেছে বলে জানা যায়।

জুরাছড়িতে জোন কমান্ডারের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ

রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া সেনা জোনের জোন কমান্ডার জুলফিকলী আরমান বিখ্যাত দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা অপব্যবহার করে জুরাছড়ি এলাকায় ব্যাপক চাঁদাবাজি করে আসছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গত ২৮ আগস্ট নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যবসায়ী ও গ্রামবাসীর সূত্রে আবারও এই চাঁদাবাজির খবর পাওয়া গেছে। তারা বলেন, সম্প্রতি জোন কমান্ডার প্রত্যেক কাঠ বা অন্যান্য ব্যবসায়ীর কাছ থেকে হয় সিমেন্ট বা লোহার রড বা অন্যান্য সামগ্রী অথবা নগদ অর্থ নিয়ে থাকেন।

জোন কমান্ডারের সাম্প্রতিক চাঁদাবাজির কয়েকটি উদাহরণ হল-

(১) রাঙ্গামাটির কাঠ ব্যবসায়ী মো: জাকির এর কাছ থেকে নিয়েছেন ১০০ বস্তা সিমেন্ট।

(২) সংখু চাকমা নামে আরেক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নিয়েছেন ৩০০ কেজি লোহার রড।

(৩) জুরাছড়ির শীলছড়ি এলাকার ব্যবসায়ী জিতুলাল চাকমার কাছ থেকে নিয়েছেন ১০০ বস্তা সিমেন্ট।

(৪) রাঙ্গামাটির ব্যবসায়ী মো: শাহ আলমের কাছ থেকে নিয়েছেন ১০০ বস্তা সিমেন্ট।

(৫) রাঙ্গামাটির আরেক ব্যবসায়ী মো: হিরা'র কাছ থেকে নিয়েছেন ৩০০ কেজি লোহার রড।

আরো জানা যায়, এ জাতীয় কোনো সামগ্রী না দিলে নাকি কোনো মালামালই তিনি ছাড় দেন না। এছাড়া কাঠ নেয়ার প্রতি পারমিট থেকে প্রতি ফুটে ৫০ টাকা হারে নেন। আবার একটি কাঠের পারমিট নিলে তার জন্য ৩০ লগ সেগুন গাছ দিতে হয়। সম্প্রতি সিগারেট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তিনি প্রতিমাসে ৬ লক্ষ টাকা চাঁদা আদায় করেন বলে জানা যায়। এছাড়া জুরাছড়ি সদরের কাঠ ব্যবসায়ী মো: কাশেম ও গরু ব্যবসায়ী মো: সাহাবুদ্দিন এর কাছ থেকে চাঁদা আদায় করেন বলে খবর পাওয়া যায়।

রুমায় জুম্মদের ভূমি বেদখল করে নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপন

বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার রুমা সদর ইউনিয়নের লাইরুংপি পাড়ায় দুই জুম্ম গ্রামবাসীর রেকর্ডভুক্ত ভূমি বেদখল করে নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, উক্ত সেনা ক্যাম্প নির্মাণের কাজে আশেপাশের ১০টি জুম্ম গ্রামের অধিবাসীদের বিনাপয়সায় গাছ, বাঁশ, ছন ইত্যাদি দিতে এবং বিনাপারিশ্রমিকে সেখানে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে বলেও খবর পাওয়া গেছে। ভুক্তভোগী ১০টি গ্রাম হল- ইডেন পাড়া, ইডেন রোড পাড়া, লাইরুংপি পাড়া, থানা পাড়া, বরশী পাড়া, মুনলাই পাড়া, মংসাদি পাড়া, ক্যইম্বওয়া পাড়া, সুদুইমক পাড়া ও রিংতুই (হমক্রি) পাড়া।

গত ৩১ আগস্ট ২০২৪ রুমা সদর ইউনিয়নের রিংতুই (হমক্রি) ম্রো পাড়া গ্রামের ৩২ জন ম্রো গ্রামবাসী ঐ সেনা ক্যাম্পে কাজ করতে গিয়ে তাদের মধ্যে অন্তত ১৬ জন আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। ক্যাম্প নির্মাণের কাজ করার সময় হঠাৎ চাল ভেঙে পড়লে উক্ত গ্রামবাসীরা আঘাতপ্রাপ্ত হন। আঘাতপ্রাপ্তদের মধ্যে পায়া ম্রো (৩৫), পীং-মৃত থোয়াং ম্রো নামে এক গ্রামবাসী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

ঐ সেনা অভিযানের দোহাই দিয়ে ২৮ বীর রুমা জোনের জোন কমান্ডার লে: কর্নেল ক ম আরাফাত ও রুমা বাজার সেনা ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার মো: কবির এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল লাইরুংপি পাড়ায় দুই জুম্ম গ্রামবাসীর রেকর্ডভুক্ত ১০ একর পরিমাণ ভূমি অবৈধভাবে দখল করে তৎস্থলে নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উক্ত ভূমির মালিক গ্রামবাসীরা হলেন- লালঠান লিয়াং লুসাই, পীং-মৃত ঠান লিয়াং লুসাই ও জৌসাং লুসাই, পীং-মৃত সি ডাঙ্গা লুসাই।

উক্ত ১০টি গ্রামের মধ্যে ইডেন পাড়া, ইডেন রোড পাড়া, লাইরুংপি পাড়া- এই তিনটি গ্রামের লোকজন কেবল বম সম্প্রদায়ের হওয়ার কারণেই শুক্রবার বাদে সপ্তাহের প্রত্যেকদিন কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যান্য গ্রামেরা লোকেরা সপ্তাহে পালাক্রমে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে।

জানা গেছে, যেখানে নতুন ক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে সেখানে দুই জায়গার মালিক কর্তৃক রোপিত সেগুন, গামারি, গোদা, করই, মেহগনি ইত্যাদি মূল্যবান গাছ এবং হাজার হাজার বাঁশ রয়েছে। ক্যাম্প নির্মাণে সেগুলো কেটে ফেলা হলেও কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে না। এতে জায়গার মালিকদের কমপক্ষে ১০-১৫ লক্ষ টাকার বনজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে জানা গেছে।

বাঙ্গালহালিয়ায় মগ পার্টিকে নিয়ে সেনাবাহিনীর ষড়যন্ত্র

গত সেপ্টেম্বরে রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নে সেনা মদদপুষ্ট মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ব বৃদ্ধি পেলে, বিশেষ করে বাঙ্গালহালিয়া বাজারে এক বয়স্ক দোকানদারকে চাঁদা নিয়ে মারধরের পর স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতা মগ পার্টির ২ সন্ত্রাসীকে গণপিটুনি দেয় এবং মগ পার্টির আস্তানায় অগ্নিসংযোগ করে সন্ত্রাসীদের বাঙ্গালহালিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য করে।

কিন্তু এর কয়েকদিন পরেই সেনাবাহিনী আবারও মগ পার্টির সন্ত্রাসীদের বাঙ্গালহালিয়ায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, তারা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জেএসএস'র প্রসঙ্গ টেনে এনে কোনো কৃত্রিম সংঘাত বা সংকট তৈরি করে মগ পার্টিকে দিয়ে পরিস্থিতিকে অধিকতর অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছে বলেও নানা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

গত ২৫ আগস্ট বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আদুমং মারমা অপহরণ ঘটনা এবং মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ আদায়ের চেষ্টার পশ্চাতেও সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততা ও ষড়যন্ত্র থাকার প্রমাণ স্থানীয় সূত্রে পাওয়া গেছে।

গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সকালের দিকে রাজস্থলী সেনা সাব-জোন থেকে সেনাবাহিনীর ৬টি গাড়ি বাঙ্গালহালিয়া অভিমুখে রওনা দেয়। পথিমধ্যে গাইন্দ্যা বাজার (৫নং বাজার) থেকে ৩টি গাড়ি ফিরে যায় এবং অপর ৩টি গাড়ি বাঙ্গালহালিয়া সেনা ক্যাম্পে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ৬টি গাড়ি বহরের মাঝখানে একটি সাদা মাইক্রোবাসও ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, সাদা মাইক্রোবাসটিতে মগ পার্টির সদস্য এবং সম্প্রতি অপহৃত ইউপি চেয়ারম্যান আদুমং মারমা ছিলেন।

স্থানীয় সূত্র আরো জানায়, মাইক্রোবাস সহ সেনাবাহিনীর গাড়ির বহর বাঙ্গালহালিয়া পৌঁছার সাথে সাথে সেনাবাহিনী কর্তৃক আশেপাশের গ্রামবাসীদের নিয়ে বাঙ্গালহালিয়া সেনা ক্যাম্পে একটি জরুরি সভা আয়োজন করা হয়। সভায় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়, অপহৃত চেয়াম্যানকে উদ্ধার করতে হলে জেএসএস (জনসংহতি সমিতি)-এর সাথে যুদ্ধ করতে হবে। এজন্য যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে, জনগণকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানানো হয়।

বালুখালী ও মগবান এলাকায় টহল অভিযান, ঘরবাড়ি তল্লাশি

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বালুখালী ও মগবান ইউনিয়নে সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্ম গ্রামে হয়রানিমূলক টহল অভিযান পরিচালনা করার খবর পাওয়া গেছে। গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, সকালের দিকে বালুখালী ইউনিয়নের রাজমনি পাড়া সেনা ক্যাম্প থেকে সুবেদার শাহাদাৎ ও হাবিলদার মেজর আলমগীর এর নেতৃত্বে ১০ জনের একটি সেনাদল কাইন্দ্যামুখ হ্রদ এলাকা এবং কাইন্দ্যা মগ বাজার এলাকায় টহল অভিযান চালায়। এসময় সেনা সদস্যরা স্থানীয় সাবেক মেম্বার সঞ্চয় চাকমার বড় ভাইকে (নাম অজ্ঞাত) দীর্ঘক্ষণ আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে হয়রানি করে। পরে উক্ত সেনা সদস্যরা বালুখালী ও মগবান ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী গুরুহাবা নামক এলাকায়ও টহল ও তল্লাশি অভিযান চালায়।

একইদিন গবঘোনা সেনা ক্যাম্প থেকে ক্যাপ্টেন বখতিয়ার এর নেতৃত্বে ১৭ জনের একটি সেনাদল মগবান ইউনিয়নের দোগেয়ে পাড়া গ্রামে টহল অভিযান চালিয়ে শুভমঙ্গল চাকমা নামে এক গ্রামবাসীরা বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। এসময় শুভমঙ্গল চাকমা বাড়িতে ছিলেন না। এসময় ক্যাপ্টেন বখতিয়ার শুভমঙ্গল চাকমার স্ত্রীকে নানা হুমকি ও হয়রানিমূলক কথা বলেন বলে জানা যায়। এরপর সেনা সদস্যরা আশেপাশের এলাকায়ও তল্লাশি অভিযান চালায়। এতে স্থানীয় জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনীর বাড়ি তল্লাশি, টাকা ছিনতাই, একজন আটক

রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ৬ জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়িতে তল্লাশি, টাকা ছিনতাই, জিনিসপত্র ভাঙচুর ও এক ব্যক্তিকে ক্যাম্পে আটক করে রাখার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অপরদিকে, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বালুখালী ও মগবান ইউনিয়নে সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্ম গ্রামে হয়রানিমূলক টহল অভিযান পরিচালনা করার খবরও পাওয়া গেছে।

গত ৯ সেপ্টেম্বর বিকাল আনুমানিক ২:৩০ টার দিকে জুরাছড়ি উপজেলা সদরের যক্ষা বাজার সেনা ক্যাম্পের জনৈক কমান্ডারের নেতৃত্বে ১৫/২০ জনের একটি সেনাদল ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বালুখালীমুখ পাড়া (বিহার পাড়া) গ্রামে টহল অভিযান চালায়। এসময় সেনা সদস্যরা ৬টি জুম্মর বাড়িতে তল্লাশি চালায়, জিনিসপত্র ভাঙচুর করে এবং এক জুম্ম পরিবারের কাছ থেকে অর্ধলক্ষাধিক টাকা ছিনিয়ে নেয়।

তল্লাশির শিকার বাড়ির মালিকরা হলেন: ১. ত্রিনয়ন চাকমা (৩৫), পীং-বীরোলাক্কো চাকমা; ২. রুনেল চাকমা হংসরাজা (৩০), পীং-বীরোলাক্কো চাকমা; ৩. বীরোলাক্কো চাকমা (৫৮), পীং-মৃত রমনীমোহন চাকমা; ৪. ভাগ্যধন চাকমা (৪৫), পীং-বিলাস কুমার চাকমা; ৫. অর্জুন চাকমা (৩৮), পীং-বিলাস কুমার চাকমা ও ৬. দেবরায় চাকমা (৩৮), পীং-ভাগ্য লক্কো চাকমা।

অভিযোগ রয়েছে, তল্লাশি করার সময় সেনা সদস্যরা বাড়িতে পাওয়া ত্রিনয়ন চাকমার নগদ ৬৮,০০০ টাকা এবং ত্রিনয়ন চাকমার মেয়ের কাছে পাওয়া আরো ২,০০০ টাকা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়। আরো জানা গেছে, তল্লাশি শেষে ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার সময় সেনা সদস্যরা রুনেল চাকমা ও অর্জুন চাকমাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে পরে অর্জুন চাকমাকে ছেড়ে দিলেও সেনাবাহিনী রুনেল চাকমাকে ক্যাম্পে আটকে রাখে।

রাঙ্গামাটির বালুখালী এলাকায় সেনাবাহিনীর হয়রানিমূলক টহল ও তল্লাশি

গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে বালুখালি ইউনিয়নের কুকিপাড়া সেনা ক্যাম্প থেকে জনৈক সুবেদারের (নবাগত) নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি সেনাদল ভিজা কিজিং বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান গ্রহণ করে, পরে ভিজা কিজিং এলাকায় টহল অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় সেনা সদস্যরা নিখিল চাকমা (২৭), পীং- প্রভাত চন্দ্র চাকমা ও হিরোলাল চাকমা (৪৬), পীং-অজ্ঞাত নামে দুই গ্রামবাসীকে তাদের দলের সাথে কিছুক্ষণ আটকে রেখে হয়রানি করে মোবাইল ক্যামেরায় ছবি তোলে। এছাড়া সেনা সদস্যরা ওই গ্রামবাসীদের কাছ থেকে গ্রামে আগে কত পরিবার ছিলো, এখন কত পরিবার আছে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করে হয়রানি করে। উক্ত সেনাদলটি ঐদিন সারা গ্রাম টহল অভিযান চালিয়ে সারারাত গ্রামেই অবস্থান করে বলে জানা গেছে। পরদিন ভোরে তারা ক্যাম্পে ফিরে যায়।

রাঙ্গামাটির মগবান এলাকায় সেনাবাহিনীর হয়রানিমূলক টহল ও তল্লাশি

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ সকাল ৯:৩৫ টায় মগবান ইউনিয়নের গবঘোনা সেনা ক্যাম্প থেকে ক্যাপ্টেন বখতিয়ার এর নেতৃত্বে ১০/১৫ জনের একটি সেনা টহল দল গরগজ্যাছড়ি গ্রাম এলাকায় টহল অভিযান পরিচালনা করে। এতে এলাকার জনগণের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়।

এর পূর্বে, গত ১০ সেপ্টেম্বর, বিকাল আনুমানিক ৩টার দিকে, বালুখালী ইউনিয়নের মরিচ্যাবিল সেনা ক্যাম্প হতে সুবেদার মো: শাহদাৎ হোসেন এর নেতৃত্বে ১২ জনের একটি সেনা টহল দল কাইন্দ্যা পাড়ায় গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। একই দিন রাত ৮টার দিকে রাঙ্গামাটি সদর সেনা জোন হতে জনৈক ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে ৩০ জনের আরেকটি সেনাদল একই স্থানে গিয়ে পূর্বোক্ত সেনাদলের সাথে মিলিত হয়ে কাইন্দ্যা পাড়া এলাকার বাড়িতে বাড়িতে প্রবেশ করে ও দোকানপাটে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করে। এছাড়া গ্রামের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলেও তল্লাশি চালায়। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্কের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

এসময় সেনা সদস্যরা রিপন চাকমা ও কুসুম চাকমা নামে দুই গ্রামবাসীকে সাময়িক আটক রেখে মোবাইলে ছবি তোলে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করে হয়রানি চালায়। টহল ও তল্লাশি অভিযান পরিচালনার সময় সেনা সদস্যরা ৮ ব্যক্তির বাড়িতে ও ২টি দোকানে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। তল্লাশির শিকার বাড়ির মালিকরা হলেন- ১. লক্ষীময় চাকমা, ২. রিপন চাকমা, ৩. কুসুম চাকমা, ৪. আল্যেরাম চাকমা, ৫. আলি চাকমা, ৬. ভাত্তোরাম চাকমা, ৭. টিংকু চাকমা, ৮. চিত্তিছ চাকমা। এছাড়া তল্লাশির শিকার দোকানের মালিকরা হলেন- ১. টুদো চাকমা ও ২. কৃষ্ণ চাকমা।

এছাড়াও, গত ১০ সেপ্টেম্বর, সকাল ৯ টার দিকে, বালুখালীর রাজমনি পাড়া সেনা ক্যাম্প থেকে সুবেদার শাহাদাৎ এর নেতৃত্বে ১০ জনের একটি সেনা টহল দল মগবান ইউনিয়নের গরগজ্যাছড়ি গ্রামে গিয়ে সাবেক ইউপি মেম্বার দীপঙ্কর চাকমাকে খোঁজ করে এবং গ্রামে প্রায় ঘন্টা খানেক টহল অভিযান চালায় বলে জানা যায়।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ৩ জুম্মকে আটক এবং ঘরবাড়ি তল্লাশি ও জিনিসপত্র ভাঙচুর

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জুরাছড়ি উপজেলায় ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়নের ঘিলাতুলী গ্রামে সেনাবাহিনী কর্তৃক বাড়ি তল্লাশি ও জিনিসপত্র ভাঙচুর এবং তিন জন নিরীহ জুম্মকে আটক করে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৫:০০ ঘটিকার সময় জুরাছড়ি উপজেলাধীন বনযোগী ছড়া জোনের, জোন কমান্ডার জুলকিফলী আরমান বিখ্যাতর নেতৃত্বে ৫০ থেকে ৬০ জনের সেনাবাহিনীর একটি টহল দল উপজেলার ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়নের ঘিলাতুলী নামক গ্রামে গিয়ে উক্ত গ্রামের বাসিন্দা টুক্কোমুনি চাকমা (৩৫), পিতা- দীপ্তি ময় চাকমা, আলোক প্রিয় চাকমা, পিতা - ফজুবাপ, অধীর চাকমা, পিতা- বগরা চাকমা, সম্মুনি চাকমা (৪২),

পিতা- সুর্য্য নাথ চাকমা, এবং উজ্জ্বল চাকমা (৪৫), পিতা- দীপ্তি ময় চাকমার বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় এবং জিনিসপত্র ভাঙচুর করে।

একপর্যায়ে তল্লাশি অভিযান শেষে সম্মুনি চাকমা ও উজ্জ্বল চাকমা নামের দুজনকে সেনাবাহিনী আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। অপরদিকে, বালখালী মুখ পাড়া হতে দেবাশীষ চাকমার বাড়ি থেকে রাত ১২টার দিকে মধ্য বালুখালী গ্রামের বাসিন্দা বিনয় লাল চাকমার ছেলে দিপন চাকমাকে ধরে নিয়ে যায়। তবে উক্ত দিপন চাকমা অরবিন্দু হত্যা মামলার সন্দেহ জনক এজাহারভুক্ত আসামী বলেও জানা গেছে।

রাঙ্গামাটি সদর এলাকায় আবারও সেনাবাহিনীর হয়রানিমূলক টহল অভিযান

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক আবারও রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বালুখালী ও মগবান ইউনিয়নে জুম্ম গ্রামে হয়রানিমূলক টহল অভিযান পরিচালনা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে বালুখালী ইউনিয়নের রাজমনি পাড়া সেনা ক্যাম্প থেকে সুবেদার শাহাদাৎ এর নেতৃত্বে ১৬ জনের একটি সেনা টহল দল মরিচ্যাবিল এলাকা হয়ে মবগান ইউনিয়নের গরগজ্যাছড়ি এলাকায় টহল অভিযান চালায়।

এসময় সেনাদলটি গরগজ্যাছড়ি গ্রামের চিন্তা মনি চাকমার (৩৫) এক স্কুল পড়ুয়া ছেলেকে একটি নৌকা দিয়ে ৩ জন করে ৪ বারে সেনা সদস্যদের হ্রদ এলাকা পারপার করতে বাধ্য করে। এরপর সেনা সদস্যরা স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান গ্রহণ করে বলে জানা যায়।

অপরদিকে একইদিন সন্ধ্যা ৬টার দিকে মগবান ইউনিয়নের গবঘোনা সেনা ক্যাম্প থেকে ক্যাপ্টেন বখতিয়ারের নেতৃত্বে ২২ জনের একটি সেনা টহল দল স্থানীয় গবঘোনা গ্রামের কান্দারা চাকমার (৩৫) এক ছোট ছেলেকে জোর করে পথ দেখাতে নিয়ে যায়। এসময় সেনাদলটি দুই দলে ভাগ হয়ে একটি স্থল পথে, আরেকটি জলপথে আশেপাশের এলাকায় টহল অভিযান চালায়। পরদিন (১৮ সেপ্টেম্বর) সেনা সদস্যরা ক্যাম্পে ফিরে যায় বলে জানা যায়।

বান্দরবানের কুহালঙে সেনাবাহিনী কর্তৃক ২ কন্যাশিশু ও পিতা মারধরের শিকার

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বান্দরবার উপজেলা সদরের কুহালং ইউনিয়নে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক মারমা দোকানদার এবং দুই কন্যাশিশু ব্যাপক মারধরের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভুক্তভোগী মারমা দোকানদারের নাম উহ্লাসাইন মারমা (৪৫), গ্রাম- কিবুক পাড়া, কুহালং ইউনিয়ন এবং তার দুই শিশুর নাম সাইমাউ মারমা (১৬) ও সাথুইমা মারমা (১৩)। তারা সবাই স্থানীয়ভাবে পল্লী চিকিৎসকের চিকিৎসা নেয় বলে জানা গেছে।

ঐদিন বিকাল ৫:২০ টার দিকে কুহালং ইউনিয়নের ডলুপাড়া সেনা জোন থেকে কমান্ডার মো: সফিউদ্দিন এর নেতৃত্বে ২৫ জনের একটি সেনাদল পার্শ্ববর্তী কিবুক পাড়ায় টহল অভিযানে যায়। সেখানে যাওয়ামাত্রই কোনো কথা না বলে, কোনো সময় না দিয়ে সেনা সদস্যরা স্থানীয় দোকানদার উহ্লাসাইন মারমাকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করে। এসময় উহ্লাসাইন মারমা সবেমাত্র গোসল করেছেন বলে জানান। তারপরও সেনা সদস্যরা বারবার নতুন লোকজন দেখেছ কিনা জানতে চাইলে, উহ্লাসাইন মারমা বলেন, আমি নতুন লোকজন গ্রামে কাউকে দেখিনি। এরপর সেনা সদস্যরার উহ্লাসাইন মারমাকে বেধরক মারধর শুরু করে।

এসময় সামান্য দূরে থাকা উহ্লাসাইন মারমার দুই কন্যাশিশু সন্তান সাইমাউ মারমা ও সাথুইমা মারমা এগিয়ে এসে তাদের পিতাকে মারধর না করতে বলে। সেনা সদস্যরা তখন ওই নারী শিশুকে বেদম মারধর করে। এতে তারা আহত হয়। সেনাসদস্যরা এসময় দোকানের জিনিসপত্রও তছনছ করে দেয় এবং ভাঙচুর চালায়। সেনাবাহিনী প্রায় এক ঘন্টব্যাপী সেখানে অবস্থান করে। তবে যাওয়ার আগে ভুল তথ্যে মারধরের ঘটনা ঘটেছে বলে মন্তব্য করেন ডলুপাড়ার জোন কমান্ডার মো: সফিউদ্দিন।

বরকলের বড় হরিনায় সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্ম গ্রামবাসীর জায়গা বেদখলের হুমকি

রাঙ্গামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলার ৫নং বড় হরিনা ইউনিয়নে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক জুম্ম গ্রামবাসীর তার বসতভিটা, ফলজ বাগান সহ বেদখলের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, শুক্রবার, ৫নং বড় হরিনা ইউনিয়নে অবস্থিত মাঝিপাড়া সেনা ক্যাম্পের ২০ ইজিবি কমান্ডার মেজর শামীম ইউনিয়নের ১৬২নং চিবা বড় হরিনা মৌজাধীন মাঝিপাড়া গ্রামের অধিবাসী মিন্টু বিকাশ চাকমা (৩২), পীং- সমচন্দ্র চাকমা-কে ক্যাম্পে ডেকে এই হুমকি দেয়। সেখানে মিন্টু বিকাশ চাকমার ৫ একর পরিমাণ জায়গা রয়েছে, তাতে তার বসতভিটা, বিভিন্ন ফলজ বাগান ও জুমের চাষ রয়েছে। মেজর শামীম ঐ জায়গা সেনাবাহিনীকে দিতে হবে বলে বলেছে। মিন্টু বিকাশ চাকমা তার জায়গা দিতে অস্বীকার করলে, মেজর শামীম সেই জায়গা জোর করে দখল করা হবে বলে হুমকি দেয়।

জুরাছড়িতে শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে এসে এক জুম্ম সেনাবাহিনীর মারধর ও হয়রানির শিকার

রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি উপজেলার ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়নের সাপছড়ি গ্রামে নিজের শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে এসে রূপায়ন চাকমা সুকোমল, পীং-ফলোমনি চাকমা নামে এক জুম্ম অন্যায়ভাবে সেনাবাহিনীর মারধর ও হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভুক্তভোগী রূপায়ন চাকমার বাড়ি খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার ৩নং বর্মাছড়ি ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের উগুদোছড়ি গ্রামে বলে জানা গেছে। তিনি পেশায় একজন সিএনজি ট্যাক্সির ড্রাইভার। গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ জুরাছড়ির বনযোগীছড়া সেনা জোনের অধীন লুলাংছড়ি সেনা ক্যাম্পের সেনাবাহিনী কর্তৃক এই ঘটনা ঘটে। ২৬ সেপ্টেম্বর রূপায়ন চাকমা লক্ষীছড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে আসেন।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর সকাল আনুমানিক ৯টার দিকে লুলংছড়ি সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার জনৈক সুবেদারের নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একটি সেনাদল রূপায়ন চাকমাকে উগুদোছড়ি গ্রামে তার শ্বশুর বাড়ি থেকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। এরপর রূপায়ন চাকমার স্ত্রী স্থানীয় কার্বারিদের (গ্রাম প্রধান) সহযোগিতা নিয়ে লুলাংছড়ি সেনা ক্যাম্পে যান এবং তার স্বামীকে ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানালে সেনা সদস্যরা রূপায়ন চাকমাকে ছেড়ে দেন।

এরপর স্ত্রী, গ্রামের কার্বারিরা-সহ রূপায়ন চাকমা শ্বশুর বাড়িতে ফিরে আসেন এবং দুপুরের খাবারের পর বিশ্রাম নিতে শুরু করেন। দুপুর ২টার দিকে উক্ত সুবেদারের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল আবারও রূপায়ন চাকমাকে শ্বশুর বাড়ি থেকে ধরে লুলাংছড়ি সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং সেনা সদস্যরা রূপায়ন চাকমাকে ব্যাপক মারধর করে। পরে আবার রূপায়ন চাকমার স্ত্রী গ্রামের কার্বারিসহ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিয়ে ক্যাম্পে গেলে তখন সেনা সদস্যরা রাত ৮:৪০টার দিকে কার্বারিদের জিম্মায় রূপায়ন চাকমাকে ছেড়ে দেয়।

বিলাইছড়িতে জুম্ম গ্রামে সেনাবাহিনীর টহল অভিযান, ১ কিশোরকে মারধর ও গ্রেপ্তার

গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪, রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার ২নং কেংড়াছড়ি ইউনিয়ন ও ৩নং ফারুয়া ইউনিয়নে জুম্ম গ্রামে সেনাবাহিনী কর্তৃক হয়রানিমূলক ব্যাপক টহল অভিযান পরিচালনা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই টহল অভিযানে এক জুম্ম কিশোরকে ব্যাপক মারধর করার এবং ওই কিশোরসহ ৪ কিশোরকে আটক এবং বাড়িতে তল্লাশি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মারধরের শিকার কিশোরের নাম রিমেল চাকমা (১৭), পীং-মৃত সোনাময় চাকমা, গ্রাম- নাড়াইছড়ি সাপছড়ি, ২নং কেংড়াছড়ি ইউনিয়ন। পরে রিমেল চাকমা সহ আরো ৩ জনকে আটক করে নিয়ে যায় সেনাবাহিনী। আটকের শিকার অন্য ৩ জনের পরিচয়– ১. শিমুল চাকমা (১৬), পীং-মানিক চাকমা; ২. সুমন চাকমা (১৭), পীং-বীরোশীল চাকমা; ৩. সুনেন্টু চাকমা (১৮), পীং- নিগিরেময় চাকমা। তাদের বাড়িও নাড়াইছড়ি সাপছড়ি গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঐ দিন ২নং কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের মেরাংছড়া সেনা ক্যাম্প থেকে জনৈক কমান্ডারের নেতৃত্বে ৩২ বীর এর ১০/১২ জনের একটি সেনাদল নাড়াইছড়ি সাপছড়ি গ্রামে টহল অভিযানে গিয়ে একটি স্থানীয় চায়ের দোকানে চা খেতে বসে। এসময় রিমেল চাকমাও সেখানে বসে চা পান করছিল। সেনা সদস্যরা তাকে দেখামাত্রই হয়রানিমূলক নানাবিধ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে এবং এক পর্যায়ে বেদম প্রহার করে আটক করে। এই সময়ে সেখানে শিমুল চাকমা, সুমন চাকমা ও সুনেন্টু চাকমাও চা খেতে চায়ের দোকানের দিকে আসে। সেনাবাহিনী তাদেরকেও আটক করে। এরপর সেনাবাহিনী উক্ত ৪ কিশোর ও তরুণকে বেঁধে বিলাইছড়ি সেনা জোনে নিয়ে যায়। সেখানে কয়েক ঘন্টা আটক রাখার পর শিমুল চাকমা, সুমন চাকমা ও সুনেন্টু চাকমাকে ছেড়ে দেওয়া হলেও রিমেল চাকমাকে পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়।

এছাড়া একইদিন ৩নং ফারুয়া ইউনিয়নে অবস্থিত ফারুয়া সেনা সাব-জোন ও তক্তানালা সেনা ক্যাম্প থেকে ক্যাপ্টেন মো: সিহাব এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর আরেকটি দল রোয়াপাড়াছড়া গ্রামে টহল অভিযান চালায়। এসময় সেনা সদস্যরা বাড়ির লোকজনের অনুপস্থিতিতে কমল চাকমা (৪৫), পীং-কালামরত চাকমা নামে এক ব্যক্তির বাড়ির তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এবং জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। বাড়ির লোকজন এসময় কাজের জন্য বাইরে ছিলেন।

মগবানে সেনাবাহিনীর টহল, এক জুম্মর মাল্টা বাগানে ক্ষতি

গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি দল রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার মগবান ইউনিয়নের একটি জুম্ম গ্রামে টহল অভিযান চালায়। এসময় সেনা সদস্যরা বিনা অনুমতিতে ও বিনা পয়সায় এক জুম্ম গ্রামবাসীর মাল্টা বাগানে প্রবেশ করে ইচ্ছেমত মাল্টা খেয়ে দেয় এবং অরো অনেক মাল্টা নষ্ট করে দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ১৩ অক্টোবর বিকাল ৫টার দিকে মগবান ইউনিয়নের গবঘোনা সেনা ক্যাম্প থেকে ক্যাপ্টেন

বখতিয়ার এর নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি সেনা টহল দল ইউনিয়নের দোগায্যা পাড়া গ্রামে টহল অভিযান পরিচালনা করে। এসময় সেনা সদস্য এক জুম্ম বাগান চাষীর মাল্টা বাগানে প্রবেশ করে মাল্টা ইচ্ছেমত খায় এবং নষ্ট করে। সেখানে সেনা সদস্যরা প্রায় ২ ঘন্টা যাবৎ অবস্থান করে বলে জানা গেছে। ভুক্তভোগী ওই বাগান চাষীর নাম চিরঞ্জীব চাকমা (৪০), পীং- মৃত দয়া মোহন চাকমা।

রাঙ্গামাটির জীবতলীতে সেনা টহল ও হয়রানি

গত ২৬ অক্টোবর ২০২৪ রাঙ্গামাটি জেলাধীন রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার জীবতলী ইউনিয়নে সেনাবাহিনীর টহল অভিযান পরিচালনার সময় জুম্ম গ্রামবাসীদের বাড়িতে তল্লাশি, জিনিসপত্র তছনছ ও হয়রানি করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, ঐদিন আনুমানিক সকাল ১০টার দিকে জীবতলী ইউনিয়নের গবঘোনা সেনা ক্যাম্প হতে জনৈক সুবেদারের নেতৃত্বে ১২ জনের একটি সেনাদল জীবতলী ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের ওগোয়াছড়ি ও পেরাছড়া মুখ এলাকায় টহল অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় সেনা সদস্যরা দুই জুম্মর বাড়ি ঘেরাও করে তাতে তল্লাশি চালায়, জিনিসপত্র তছনছ করে এবং হয়রানিমূলকভাবে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। ভুক্তভোগী দুই গ্রামবাসী হলেন- ১. আথোয়াই মারমা (৫০), পীং-অজ্ঞাত ও ২. নিতাই প্রু মারমা (৫২), পীং-অজ্ঞাত।

এরপর সেনা সদস্যরা ওগোয়াছড়ি বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর পেরাছড়া মুখ পাড়ায় চলে যায়। পেড়াছড়া মুখ পাড়ায় গিয়ে সেনা সদস্যরা চিলা প্রু মারমা নামে এক গ্রামবাসীর দোকানেও ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে হয়রানি করে। এছাড়া আশেপাশের জুম্ম গ্রামে টহল অভিযান চালায়।

সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা

রাজস্থলীতে মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের মারধরের শিকার বান্দরবানের ৫ মারমা গ্রামবাসী

সেনামদদপুষ্ট মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলাধীন রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়ন সদর এলাকায় বান্দরবান জেলার অধিবাসী ৫ নিরীহ মারমা গ্রামবাসী ব্যাপক মারধরের শিকার হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

গত ৫ জুলাই এই মারধরের ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। ভুক্তভোগীরা সবাই বান্দরবান সদর উপজেলার ১নং রাজভিলা ইউনিয়নের বাসিন্দা। মারধরের শিকার ব্যক্তিরা হলেন ১। পাইসুই অং মারমা (৩৮), পীং-অংক্যথোয়াই মারমা, গ্রাম-উদাল বসনিয়া হেডম্যান পাড়া, তিনি ২নং ওয়ার্ড এর নির্বাচিত ইউপি সদস্য; ২। বাবলু মারমা (৩০), পীং- থোয়াইঅং প্রু মারমা, গ্রাম-রাজভিলা বিহার পাড়া, ১নং ওয়ার্ড, তিনি ইউনিয়ন পরিষদের অফিস সহকারী; ৩। উচ্চনু মারমা (২৫), পীং- উসাপ্রু মারমা, গ্রাম- বুড়া মেম্বার পাড়া উদলবনিয়া, ২নং ওয়ার্ড; ৪। উসাই মং মারমা (১৮), পীং- অজ্ঞাত, গ্রাম- বুড়া মেম্বার পাড়া উদলবনিয়া, ২নং ওয়ার্ড, তিনি একজন ছাত্র এবং ৫। থুইমং মারমা (২৬), পীং- অজ্ঞাত, গ্রাম- বুড়া মেম্বার পাড়া উদলবনিয়া, ২নং ওয়ার্ড।

অভিযোগ রয়েছে, বর্তমানে রাজস্থলী উপজেলায় মগ পার্টি সন্ত্রাসীরা দুটি দলে দুটি আস্তানায় অবস্থান করে সেখান থেকে যাবতীয় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালাচ্ছে। এর একটি আস্তানা অবস্থিত বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নের বাঙ্গালহালিয়া বাজারের পেছনে নাইক্যছড়া সড়কের পাশে জনৈক তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীর সেমিপাকা বাড়িতে। ঐ বাড়িটি তারা ইতিপূর্বে বাড়ির মালিকের কাছ থেকে জোর করে দখল করে এবং বাড়ির মালিককে বাড়িছাড়া করে। সন্ত্রাসীদের এই আস্তানাটি বাঙ্গালহালিয়া বাজার সেনা ক্যাম্পের মাত্র ২ শত গজের মধ্যে অবস্থিত। মগ পার্টির অপর আস্তানাটি গাইন্দ্যা ইউনিয়নের পোয়াইতু পাড়ায় অবস্থিত বলে জানা গেছে। স্থানীয়দের মতে, সেনা ক্যাম্পের পাশে অবস্থান করেই মগ পার্টির সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে এসব কর্মকান্ড চালাচ্ছে। সেনাবাহিনী দেখেও না দেখার ভান করছে।

মগ পার্টি সন্ত্রাসী কর্তৃক কাপ্তাইয়ের রাইখালী থেকে এক মারমা গ্রামবাসী অপহৃত ও খুন

সেনা-মদদপুষ্ট মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়ন এলাকা থেকে এক মারমা গ্রামবাসী অপহরণ ও হত্যার শিকার হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। অপহরণ ও হত্যার শিকার ব্যক্তির নাম জনি মারমা (৩৫), পীং- আনিমং মারমা, গ্রাম- ডলুছড়ি পাড়া, রাইখালী ইউনিয়ন। জনি মারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাইখালী ইউনিয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন, তবে

পরিস্থিতির কারণে তিনি কোনো সাংগঠনিক কাজে সক্রিয় নয় বলে জানা গেছে।

গত ২৬ জুলাই ২০২৪ ভোর রাত ১ টার দিকে মগ পার্টির চিহ্নিত সন্ত্রাসী সবুজ মারমা (৪৩) ও প্রান্ত ঘোষ রনি (৩৩) এর নেতৃত্বে ২০-২২ জনের একটি সন্ত্রাসী দল রাইখালীর ডলুছড়ি পাড়া গ্রামে আসে। এসময় তাদের সাথে সাহায্যকারী হিসেবে সেনাবাহিনীর একটি গাড়িও ছিল বলে জানা গেছে। মগ পার্টি সন্ত্রাসীরা ডলুছড়ি পাড়া গ্রামে আসার সাথে সাথে জনি মারমাকে ঘুম থেকে তুলে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

এরপর গত ২৭ জুলাই রাত আনুমানিক ৮:৩০ টার দিকে অপহৃত জনি মারমার মৃতদেহ পার্শ্ববর্তী কারিগর পাড়ার নিকটবর্তী হাতিমাড়া এলাকায় পাওয়া গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

রাজস্থলীতে মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের মারধরের শিকার এক মারমা গ্রামবাসী

সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট মগ পার্টির সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নে নিরীহ এক মারমা গ্রামবাসীকে মারধর করে গুরুতর আহত করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত ২৯ জুলাই ২০২৪ সন্ত্রাসীরা গুলুক্যা মারমা (২৫), মাতা-আপ্রামা মারমা নামে ওই গ্রামবাসীকে তার বাড়িতে গিয়ে মারধর করে বলে জানা যায়। গুলুক্যা মারমার বাড়ি বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের ডাকবাংলো পাড়া গ্রামে।

রাঙ্গামাটি শহরে ইউপিডিএফের সশস্ত্র হামলা, আহত প্রায় ১৮, অপহৃত ২ ছাত্রী

পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) ও তার অঙ্গ-সংগঠনের নেতাকর্মীরা আন্দোলনের নামে অস্ত্র ও লাঠিসোটা নিয়ে রাঙ্গামাটি শহরে এসে উস্কানিমূলকভাবে মিছিলের আয়োজন করে। এলাকায় স্থিতিশীলতার স্বার্থে পার্বত্য চুক্তির পক্ষের পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির নেতা-কর্মীরা ইউপিডিএফের কর্মীদের বিরত করতে চাইলে তারা চুক্তির পক্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর হামলা চালায়। গত ৬ আগস্ট ২০২৪ বিকাল ২টা থেকে ৩টার মধ্যে রাঙ্গামাটি শহরের পৃথক দুটি স্থানে এই হামলার ঘটনা ঘটে। সেনাবাহিনীর সামনে থেকেই ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা পিস্তল দিয়ে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে।

ইউপিডিএফের হামলায় চুক্তির পক্ষের অন্তত ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী আহত হয় বলে খবর পাওয়া যায়। আহত ৯ জন রাঙ্গামাটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে বলে জানা যায়। হামলার পর ইউপিডিএফের অপর একটি দল ভেদভেদি এলাকা থেকে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের ছাত্রী ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার দুই নেত্রীকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। অপহরণের শিকার দুই নেত্রী হলেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুষ্টি চাকমা এবং তথ্য ও প্রচার সম্পাদক কাঞ্চন মালা চাকমা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, সেদিন হঠাৎ বিকাল ২:০০ টার দিকে প্রায় একই সময়ে ইউপিডিএফের কর্মীরা পিস্তল, কান্তা-গুলি ও লাঠিসোটা নিয়ে দুই দলে বিভক্ত হয়ে রাঙ্গামাটি শহরে প্রবেশ করে। একটি দল মানিকছড়ি এলাকা থেকে টিভি ভবন হয়ে ভেদভেদি এলাকায় চলে আসে। অপর একটি দল নানিয়ারচর-কুতুকছড়ি এলাকা থেকে ১৫ এর অধিক ট্রলারযোগে রাজবাড়িস্থ শিল্পকলা একাডেমি ঘাটে অবতরণ করে শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে জমায়েত হতে থাকে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এসময় টিভি ভবন এলাকায় অবস্থান করা এলাকাবাসী এবং চুক্তির পক্ষের পিসিপি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের একটি দলের উপর হামলা চালায় ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা। এতে উভয়পক্ষের কয়েকজন আহত হয় বলে জানা যায়। একপর্যায়ে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে সেখান থেকে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের দুই নেত্রী সুষ্টি চাকমা ও কাঞ্চনা চাকমাকে অপহরণ করে কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া এলাকার দিকে নিয়ে যায় বলে জানা যায়।

অপরদিকে প্রায় একই সময়ে রাজবাড়ির শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে জড়ো হওয়া ইউপিডিএফের অপর দলটি মিছিল করতে চাইলে সেনাবাহিনী তাদেরকে বাধা প্রদান করে। এক পর্যায়ে কিছু দূরে অবস্থান করা চুক্তির পক্ষের পিসিপি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও যুব সমিতির কর্মীদের উপর হামলা চালায় ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা।

এরপর ইউপিডিএফের দলটি তরিঘরি করে তাদের আনা ১৫টির অধিক ট্রলার বোটে উঠে এবং কিছুক্ষণ হ্রদ এলাকায় ভাসমান অবস্থায় থেকে রাজদ্বীপ এলাকা হয়ে নানিয়ারচরের দিকে ফিরে। যাওয়ার সময় তারা কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে বলেও এলাকাবাসীর সূত্রে জানা যায়। এর অতি সন্নিকটে রাঙ্গামাটি সেনা ব্রিগেড থাকলেও সেনাবাহিনী সশস্ত্র ইউপিডিএফ সদস্যদের আটকের চেষ্টা করেনি।

গ্রামবাসীরা জানান, ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা এই হুমকি দেয় যে, যদি তারা তাদের মিছিল-সমাবেশে যোগ না দেয় তাহলে

প্রত্যেককে ৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে এবং বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে।

বান্দরবানে সেনামদদপুষ্ট সন্ত্রাসীদের কর্তৃক চাঁদাবাজি ও মুক্তিপণ আদায়ের অভিযোগ

সম্প্রতি পার্বত্য জেলা বান্দরবানে সেনামদদপুষ্ট ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) ও সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের কর্তৃক চাঁদাবাজি ও অপহরণের পর ব্যাপক মুক্তিপণ আদায় করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত ৮ আগস্ট ২০২৪, সকাল ৯ টার দিকে বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক রাস্তামাথা এলাকায় ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) ও সংস্কারপন্থী জেএসএস সন্ত্রাসীদের দুই সদস্য চট্টগ্রাম-বান্দরবান সড়কে মালবাহী ট্রাক থেকে চাঁদা তুলতে শুরু করে। এসময় পাহাড়ি-বাঙালি এলাকাবাসী খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং চাঁদা উত্তোলনকারী দু'জনকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেয়। এক পর্যায়ে সেনাবাহিনী সদস্যরা একটি গাড়িতে এসে তাদেরকে তুলে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় সেনা সদস্যরা ঘটনাটি কোথাও প্রকাশ না করার জন্য এলাকাবাসীকে নির্দেশ দিয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের মধ্যে একজনের নাম নুমং মারমা (৩০), পিতা-অজ্ঞাত, বাড়ি রাজস্থলী এবং অপরজন একজন খিয়াং যুবক (নাম অজ্ঞাত) বলে জানা গেছে।

অপরদিকে, গত ১৬ জুলাই ২০২৪, সন্ধ্যা ৭ টার দিকে অটল চাকমা (৪০) এর নেতৃত্বে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) ও সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের অপর একটি দল বান্দরবান সদরের সুয়ালক এলাকার 'ইকোভ্যালি রিসোর্ট' থেকে ফেরার পথে মংতিং মারমা (৩৮) নামে এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে। মংতিং মারমা 'ইকোভ্যালি রিসোর্ট' এর মালিক বলে জানা গেছে। অপহৃত অংতিং মারমার পিতা মংথোয়াইচিং মারমা সুয়ালক মৌজার হেডম্যান এবং বাড়ি সুয়ালকপাড়া গ্রামে।

জানা গেছে, অপহরণকারী সন্ত্রাসীরা গত ১৮ জুলাই, মংতিং মারমার পিতা হেডম্যান মংথোয়াইচিং মারমাকে ফোন করে তার ছেলের মুক্তিপণ হিসেবে ১ কোটি টাকা দাবি করে। এরপর গত ২৩ জুলাই, হেডম্যান মংথোয়াইচিং মারমা তার ছেলের মুক্তির জন্য অপহরণকারী সন্ত্রাসীদের ৬৫ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দিতে বাধ্য হন এবং ঐদিনই সন্ত্রাসীরা মধ্যরাতে অপহৃত মংতিং মারমাকে গাড়িতে সুয়ালকপাড়া গ্রামে এসে ছেড়ে দিয়ে যায় বলে জানা যায়।

বাঙ্গালহালিয়ায় গণপিটুনিতে আহত মগ পার্টির দুই সন্ত্রাসী, আস্তানায় অগ্নিসংযোগ

রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নের বাঙ্গালহালিয়া বাজারে স্থানীয় বাঙালি-পাহাড়ি বিক্ষুব্ধ জনতার গণপিটুনিতে সেনামদদপুষ্ট সন্ত্রাসী সংগঠন মগ পার্টির দুই সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া, বাজারের পার্শ্ববর্তী সন্ত্রাসীদের আস্তানা হিসেবে ব্যবহৃত বাড়িটিতে উত্তেজিত জনতা অগ্নিসংযোগ করেছে বলে জানা গেছে। গত ২০ আগস্ট ২০২৪ সকাল আনুমানিক ৮:৩০টা - ৯:৩০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

গণপিটুনিতে আহত মগ পার্টির দুই সদস্যের নাম চিংসু মারমা (৪০) ও মন্ডি মারমা (৩৫)। তারা উভয়েই মগ পার্টির কালেক্টর (চাঁদা সংগ্রাহক) ও সশস্ত্র সদস্য বলে জানা গেছে। পরে সেনাবাহিনীর সহায়তায় আহত মগ পার্টির সদস্যরা চন্দ্রঘোনা মিশন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেয়।

গত ২০ আগস্ট সকাল আনুমানিক ৮:৩০ টার দিকে মগ পার্টির উক্ত দুই চাঁদা সংগ্রাহক বাঙ্গালহালিয়া বাজারে গিয়ে আজিজ সওদাগর (৬৫) নামে এক দোকানদারের সাথে চাঁদা সংগ্রহ নিয়ে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে মগ পার্টির সদস্যরা আজিজ সওদাগরকে বেদম মারধর করে।

এদিকে ক্ষুব্ধ জনতা সংগঠিত হয়ে বাঙ্গালহালিয়া বাজার সংলগ্ন মগ পার্টির আস্তানা হিসেবে ব্যবহৃত সেমি-পাকা ও টিনের চালা বাড়িতে গিয়ে বাড়িটিতে অগ্নিসংযোগ করে। এসময় ৭/৮ জন মগ পার্টির সদস্যকে সশস্ত্র অবস্থায় দেখা গেলেও, কয়েক হাজার জনগণের সমাবেশ দেখে সন্ত্রাসীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

এসময় জনগণের চাপে সেনা সদস্যরা দুই দিনের মধ্যে বাঙ্গালহালিয়া থেকে মগ পার্টির সদস্যদের সরিয়ে নিয়ে যাবে বলে অঙ্গীকার করে। পরে কাপ্তাই সেনা জোনের কমান্ডার সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনিও দুই দিনের মধ্যে মগ পার্টির সদস্যদের বাঙ্গালহালিয়া বাজার এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবেন বলে অঙ্গীকার করেন। এরপর সেনা সদস্যরা নিজেরাই একটি জীপ গাড়ির ব্যবস্থা করে মগ পার্টির আহত দুই সদস্যকে চিকিৎসার জন্য চন্দ্রঘোনা মিশন হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

রাজস্থলীতে মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের কর্তৃক এক ইউপি চেয়ারম্যান অপহৃত

গত ২৫ আগস্ট ২০২৪, বিকাল আনুমানিক ৩ টার দিকে সেনা মদদপুষ্ট মগ পার্টি খ্যাত মারমা ন্যাশনালিস্ট পার্টি'র সন্ত্রাসীদের কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আদুমং মারমা (৫০) অপহরণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পরে বিকেলে প্রশাসনের লোকজনের মাধ্যমে মগ পার্টির নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করা হলে, তারা বিষয়টি অস্বীকার করেছে বলে জানা গেছে। পরে ১২ সেপ্টেম্বর তাকে ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মগ পার্টি সন্ত্রাসীরা চেয়ারম্যান আদুমং মারমাকে ছেড়ে দেয় সন্ত্রাসীরা।

দীঘিনালার বাবুছড়ায় ইউপিডিএফ কর্তৃক বাজারের উপর নিষেধাজ্ঞায় ২২ গ্রামের মানুষ ভোগান্তিতে

পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ কর্তৃক খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার ৫নং বাবুছড়া ইউনিয়নের বিশেষত ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত প্রায় ২২টি গ্রামের জনগণকে বাজারে যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি বা কেনাবেচায় কঠোর নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেওয়ার কারণে এলাকাবাসী ব্যাপক দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। অপরদিকে, জোর করে, হুমকি দিয়ে তারাই আবার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মোটা অংকের চাঁদাও আদায় করছে।

গত প্রায় এক মাসের অধিক সময় ধরে ইউপিডিএফ সদস্যরা গ্রামবাসীদের উপর এই অন্যায় ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে বলে গ্রামবাসীর সূত্রে জানা গেছে। গত ২৬ আগস্ট ২০২৪ গ্রামবাসীদের কাছ থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। স্থানীয়রা জানান, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহে ইউপিডিএফের বাধা দানের কারণে স্থানীয় দোকানগুলোও বন্ধ হয়েছে। এতে দোকান ব্যবসায়ীরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন এবং গ্রামবাসী নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবের কারণে চরমভাবে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। বিশেষ করে চাল, ভোজ্য তেল, সিদোল এবং বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী বাজার থেকে আনতে পারছেন না গ্রামবাসীরা। অনেকে খেয়ে না খেয়ে, ন্যূনতম খাদ্যসামগ্রীর অভাবে দুর্বিষহ জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন।

যেসব জুম্ম গ্রামবাসী এই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন, সেই গ্রামগুলো হল- শিলছড়ি, হগেয়েতুলি, রিষিমোনছড়া, লাম্বাছড়া, দজরপাড়া, দেওয়ানপাড়া, বাঘেরহাট, থলছড়া, উগলছড়ি, শামুকছড়ি, নাড়াইছড়ি, দুলুছড়ি, মোজোলেংছড়া, দ্বিরেনপাড়া, নাগপুদিমাছড়া, শ্যামচরণকার্বারী পাড়া, দজরপাড়া, উল্টাচড়ি মুখ, পাকুজ্যাছড়ি, বটতলা, ধনপাতা মুখ, ভিচ্যাছড়া ইত্যাদি গ্রাম।

এলাকার এক বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বি জানান, অনেক অনুনয়-বিনয় করে কেবল মাত্র ১০ কেজি চাউল ও অল্প পরিমাণ বাজার আনার অনুমতি পেয়েছি। কিন্তু এর পরে কী হবে ভগবানই জানেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্রামবাসী জানান, এলাকার লোকজন বাজার আনতে গেলে ইউপিডিএফ কর্মীরা জোরপূর্বক বাজার কেড়ে নিয়ে বিভিন্ন অশ্লীল কথাবার্তা বলে এবং হুমকি প্রদান করে।

ভুক্তভোগী এক নারী জানান, সম্প্রতি তিনি বাজারে যেতে বাধ্য হলে ইউপিডিএফ কর্মীরা তার সেই বাজারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো কেড়ে নেয়। তাকে হুমকি দিয়ে বলা হয়, দ্বিতীয়বার বাজার আনতে গেলে প্যান্ট এবং জামা-কাপড় খুলে আসতে হবে।

জানা গেছে, ইউপিডিএফের সদস্যরা প্রশাসনের নাকের ডগায় বিভিন্ন স্থানে চেক পোস্ট ও চাঁদা সংগ্রহের পোস্ট বসিয়ে গ্রামবাসীদের উপর চাপানো তাদের নিষেধাজ্ঞার কাজ নিয়ন্ত্রণ করছে। আর এইসব কর্মকান্ডে নেতৃত্ব দিচ্ছে ইউপিডিএফের সশস্ত্র পরিচালক নয়ন চাকমা এবং চাঁদা সংগ্রাহক ও চীফ কালেক্টর রুবেল, পোস্ট কালেক্টর কমল, দেবময় ওরফে ভেঙামো, জারুলছড়ি কানা, চগুলো সহ আরো কয়েকজন।

আবারো মগ পার্টিকে বাঙ্গালহালিয়ায় নিয়ে আসতে সেনা ষড়যন্ত্র

সম্প্রতি স্থানীয় বিক্ষুব্ধ বাঙালি-পাহাড়ি জনতার প্রতিরোধের মুখে ও তাড়া খেয়ে রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গালহালিয়া থেকে সরে যেতে বাধ্য হওয়া মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের আবার বাঙ্গালহালিয়ায় নিয়ে আসতে সেনাবাহিনী ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এছাড়া সপ্তাহখানেক আগে মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের কর্তৃক বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আদুমং মারমা (৫০) অপহরণ ঘটনার সাথে সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআইয়ের যোগসাজস রয়েছে বলেও জানা গেছে। একদিকে চাঁদার অংশ ভাগ পেতে এবং অপরদিকে বাঙ্গালহালিয়ায় মগ পার্টির সন্ত্রাসীদের নিয়ে আসার জন্য সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআই এই ঘটনায় যুক্ত রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গত ২০ আগস্ট ২০২৪, সকাল আনুমানিক ৮:৩০ টার দিকে মগ পার্টির চিংসু মারমা (৪০) ও মন্তি মারমা (৩৫) নামে দুই চাঁদা সংগ্রাহক বাঙ্গালহালিয়া বাজারে গিয়ে আজিজ সওদাগর (৬৫) নামে এক দোকানদারের সাথে চাঁদা সংগ্রহ নিয়ে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে মগ পার্টির সদস্যরা আজিজ সওদাগরকে বেদম মারধর করে। এর কিছুক্ষণ পরেই বাঙ্গালহালিয়া বাজারের স্থানীয় বাঙালি-পাহাড়ি বিক্ষুব্ধ জনতা মগ পার্টির উক্ত দুই সদস্যকে গণপিটুনি দিয়ে গুরুতর আহত করে এবং বাজার সংলগ্ন মগ পার্টির আস্তানায় অগ্নিসংযোগ করে। এতে মগ পার্টির সন্ত্রাসীরা বাঙ্গালহালিয়া বাজার এলাকা ত্যাগ করে তাদের মূল আস্তানা গাইন্দ্যা ইউনিয়নের পোয়াইতু পাড়ার দিকে চলে যেতে বাধ্য হয়।

গত ৩০ আগস্ট সকালে বাঙ্গালহালিয়া ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার সাফি বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নের সকল নির্বাচিত মেম্বার ও সংরক্ষিত আসনের মেম্বারদের ক্যাম্পে ডাকেন। এসময় ক্যাম্প কমান্ডার মেম্বারদেরকে চেয়ারম্যানের অপহরণ ঘটনায় জেএসএস-এর হাত আছে বলে প্রচার করার নির্দেশ দেন এবং জেএসএস-এর বিরুদ্ধে মিছিল-সমাবেশ করতে বলেন। তবে ক্যাম্প কমান্ডারের উক্ত মতের পক্ষে শুধুমাত্র ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের মেম্বার ও বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান কামাল মত দিলেও বাকি সমস্ত মেম্বারগণ দ্বিমত পোষণ করেন।

রাজস্থলীতে সেনা মদদপুষ্ট মগ পার্টি কর্তৃক জেএসএসের নাম ব্যবহার করে চাঁদাবাজি

রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলায় বিগত স্বৈরাচারী আমল থেকে সেনাবাহিনীর আশ্রয়-প্রশ্রয়ে থাকা মগ পার্টির সন্ত্রাসীরা গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতি (জেএসএস)-এর নাম ব্যবহার করে চাঁদাবাজি করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

ধারণা করা হচ্ছে, সম্প্রতি রাজস্থলীতে বিশেষত স্থানীয় ক্ষুব্ধ পাহাড়ি-বাঙালি জনতার প্রতিরোধের মুখে বাঙ্গালহালিয়া থেকে মগ পার্টির সন্ত্রাসীরা চলে যেতে বাধ্য হওয়ায়, সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআইয়েরই পরামর্শে আবার মগ পার্টির সন্ত্রাসীদের সেখানে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে 'জেএসএস'এর নাম ব্যবহার করা হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সেদিন সকালের দিকে ০১৮৫৮০৩৯৬১৩-এই মোবাইল নাম্বার থেকে জেএসএস'এর লোক পরিচয় দিয়ে রাজস্থলী উপজেলার ৩ জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নিকট ফোন করে চাঁদা দাবি করা হয়। ব্যাপারটি জানাজানি হওয়ার এক পর্যায়ে স্থানীয় জেএসএস নেতাকর্মীরাও ঘটনাটি জানতে পারেন।

পরে জেএসএসের কর্মীরা তদন্ত করে নিশ্চিত হন যে, উক্ত নাম্বারটির সাথে জেএসএস'এর কোনো সদস্যের সম্পৃক্ততা নেই। বরং ওই নাম্বার থেকে মগ পার্টির সন্ত্রাসীরাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জেএসএস'এর নাম ব্যবহার চাঁদা সংগ্রহ করছে।

উল্লেখ্য যে, মগ পার্টির সন্ত্রাসীরা শুধু যে উপরোক্ত ৩ নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে চাঁদা চেয়েছে তাই নয়, প্রায় একই সময়ে সাবেক ও বর্তমান আরও তিনি জনপ্রতিনিধির কাছ থেকেও চাঁদা করে। জানা গেছে, তারা সাবেক উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান গৌতমী খিয়াং-এর কাছ থেকে ৫,০০০/-টাকা; ঘিলামুখ ইউপি চেয়ারম্যান রবার্ট ত্রিপুরার কাছ থেকে ১০,০০০/-টাকা এবং গাইন্দা ইউপি চেয়ারম্যান উচিমং মারমার কাছ থেকে ১০,০০০/- টাকা চাঁদা দাবি করেছে।

কাউখালীতে ইউপিডিএফ কর্তৃক মানববন্ধনের জন্য গ্রামবাসীদের জোরজবরদস্তি, ৪ জনকে মারধর

গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফের একটি দল জোরজবরদস্তি করে রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামবাসীদের ঘাগড়া ইউনিয়নের ঘাগড়া বাজারে একটি মানববন্ধন করার চেষ্টা করেছে বলে জানা গেছে। জোরজবরদস্তি করতে গিয়ে ইউপিডিএফ সদস্যরা ৪ গ্রামবাসীকে ব্যাপক মারধর করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

মারধরের শিকার গ্রামবাসীরা হলেন– ১. ধন চাকমা (৪০), পিতা- মজা চাকমা, গ্রাম- জনুমাছড়া, ঘাগড়া; ২. জগদীশ চাকমা (৫৫), পিতা- রাম মোহন চাকমা, গ্রাম- জনুমাছড়া, ঘাগড়া; ৩. আবেল চাকমা (২৫), পিতা-রূপমনি চাকমা, গ্রাম- জনুমাছড়া, ঘাগড়া এবং ৪. হিমেল চাকমা, পিতা- জগদীশ চাকমা, গ্রাম- জনুমাছড়া, ঘাগড়া।

গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সকাল পৌনে এগারটার দিকে ইউপিডিএফ সদস্যরা প্রায় তিন শতাধিক লোকজনকে জোরপূর্বক ঘাগড়া বাজারে নিয়ে মানববন্ধন করার চেষ্টা করে। এজন্য ইউপিডিএফ সদস্যরা কাউখালি সদরসহ বাদলছড়ি, ঘিলাছড়ি, পানছড়ি থেকে প্রায় তিন শতাধিক জুম্মকে জোরপূর্বক নিয়ে এসে জনুমাছড়া গ্রামে জড়ো করে।

এসময় গ্রামের কার্বারিসহ গ্রামবাসীরা বিরাজমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে অনুষ্ঠান করতে পারবে না বলে ইউপিডিএফকে জানায়। ফলে গ্রামবাসীদের বাধার মুখে ওই মানববন্ধন আয়োজন সম্ভব হয়নি। কিন্তু ইউপিডিএফ সদস্যরা উক্ত ৪ গ্রামবাসীকে ব্যাপক মারধর করে সেখান থেকে চলে যায় বলে জানা যায়।

সেটেলার কর্তৃক হামলা ও ভূমি বেদখল

বাঘাইছড়িতে গ্রাফীটি অংকনে বাধাদানকারী সেটেলারদের পরিচয় পাওয়া গেছে

দেশের অন্যান্য এলাকার ন্যায় রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়িতেও জুম্ম ছাত্ররা দুই দিনব্যাপী গ্রাফীটি অংকন কর্মসূচি গ্রহণ করে। কিন্তু গ্রাফীটি অংকন শুরু করার পরপরই একদল সেটেলার যুবক সেখানে গ্রাফীটি অংকনে বাধা প্রদান করে, যা এলাকায় ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং জনগণকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেছে। অনেকের কাছে প্রশ্ন ওঠে, সেখানে গ্রাফীটি অংকনে তারা বাধা দেওয়ার কে?

জানা গেছে, সেটেলারদের সাম্প্রদায়িক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ খোরশেদ আলম এবং সেনা ও সেটেলারদের মদদপুষ্ট অনলাইন সংবাদ মাধ্যম 'পার্বত্যনিউজ' এর সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত ও মারিশ্যা বাজারের দোকানদার মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে ১০-১৫ জনের সেটেলার বাঙালিদের একটি দল এসে গ্রাফীটি অংকনের সময় জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের বাধা প্রদান করে।

গত ১৩ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৪ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার্থীরা বাঘাইছড়ি এলাকায় গ্রাফীটি অংকন কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রথমদিন বিকেলের দিকে কর্মসূচি মোতাবেক সাধারণ জুম্ম শিক্ষার্থীরা উপজেলা সদরের কাচালং ব্রিজের দেয়ালগুলোতে গ্রাফীটি অংকন শুরু করে।

কিছুক্ষণের মধ্যে বহিরাগত সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের সদস্য হিসেবে পরিচিত মোহাম্মদ খোরসেদ আলম এবং মারিশ্যা বাজারের দোকানদার ও পার্বত্য নিউজের সাংবাদিক মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে ১০-১৫ জনের একটি দল সেখানে এসে গ্রাফীটি আঁকতে বাঁধা প্রদান করে। এসময় তারা সেনাবাহিনী এবং সেনা ও সেটেলার কর্তৃক অপহৃত তৎকালীন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনার চাকমার ছবি অংকন করা যাবে না বলে উল্লেখ করে এবং করলে অসুবিধা হবে বলে হুমকি দেয়। এছাড়া উক্ত বাধা প্রদানকারী মোহাম্মদ খোরসেদ আলম বলতে থাকে যে, 'কল্পনা চাকমা তার স্বামীর সাথে ভারতের অরুনাচলে বসবাস করছেন। সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত করার জন্য এই ছবি আঁকা হচ্ছে।'

ঘটনার পর সেটেলারদের এই বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর অনেক নেটিজেন মোহাম্মদ খোরসেদ আলমকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে গিয়ে কল্পনা চাকমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার দাবি জানান। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের জোরালো প্রতিবাদ ও পাল্টা যুক্তিতে হেরে গিয়ে তারা সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। জানা গেছে, শিক্ষার্থীরা ব্রিজের দেয়ালে কল্পনা চাকমার ছবি অংকন করলেও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বা সাম্প্রদায়িকমূলক কোনো লেখা, শ্লোগান বা ছবি অংকন করেননি বলে জানা যায়।

আরও জানা গেছে, শিক্ষার্থীদের গ্রাফীটি অংকনে অন্যতম বাধা প্রদানকারী সেটেলার মোহাম্মদ খোরসেদ আলম পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। তার বাড়ি মারিশ্যার মুসলিমব্লক এলাকায়। তিনি এর আগে মোটরসাইকেলে স্থানীয় এক ব্যক্তিকে চাপা দিয়ে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত আসামী বলেও জানা গেছে।

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ

রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক আহমদ হোছাইন-এর বিরুদ্ধে ৬ষ্ঠ শ্রেণির এক জুম্ম নারী শিশু শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানি ও তার সাথে আপত্তিকর আচরণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ২ জুলাই ২০২৪ ভুক্তভোগী নারী শিশুর পিতা অভিযুক্ত ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের বরাবরে একটি স্মারকলিপিও পেশ করেছেন। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ২৯৯নং পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সংসদ সদস্য, চট্টগ্রামের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক এবং রাঙ্গামাটি জেলার শিক্ষা কর্মকর্তার বরাবরেও স্মারকলিপির অনুলিপি দিয়েছেন তিনি।

বরকলে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম কলেজ ছাত্রী ধর্ষণের চেষ্টার শিকার

রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নে দুই জন সেটেলার বাঙালি কর্তৃক কলেজ পড়ুয়া এক চাকমা ছাত্রী

(১৯) ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ধর্ষণের চেষ্টাকারী দুই সেটেলার বাঙালির পরিচয় (১) মোঃ কালু মোল্লা, ২৮ বছর, গ্রাম-বড় কড়ুদিয়া, ওয়ার্ড নং ৭, ভূষণছড়া ইউনিয়ন ও (২) মোহাম্মদ, ২৬ বছর, পীং-ছিদ্দিক, গ্রাম-একই।

গত ২৫ জুলাই ২০২৪ সকাল আনুমানিক ৯টার দিকে দুই সেটেলার যুবক পার্শ্ববর্তী বগাছড়ি গ্রামে গিয়ে বাড়িতে একা পেয়ে ওই কলেজ ছাত্রীকে ঝাপটে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এসময় মেয়েটি জোরে চিৎকার করলে পার্শ্ববর্তী লোকজন এগিয়ে আসতে দেখলে সেটেলার বাঙালিরা পালিয়ে যায়।

পরে মেয়েটির বাবা ৭নং ওয়ার্ড মেম্বার মোঃ আবু সাইদকে বিষয়টি জানিয়ে বিচার চাইলে, ওয়ার্ড মেম্বার আবু সাইদ কোনো জুম্ম মুরুব্বির উপস্থিতি ছাড়াই ভুক্তভোগী মেয়েটির বাবাকে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা দিয়ে একপ্রকার একতরফা মীমাংসা করে দেন। এব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করলে ভুক্তভোগীদের ক্ষতি হবে বলে ওয়ার্ড মেম্বার আবু সাইদ হুমকি দেন।

খাগড়াছড়ির রামগড়ে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম নারী গণধর্ষণের শিকার

গত ২২ আগস্ট ২০২৪ বৃহস্পতিবার খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের তালতলী পাড়া এলাকায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক চাকমা নারী (৪০) ধর্ষণের শিকার হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র অনুযায়ী, আট জন সেটেলার বাঙালি ঐ জুম্ম নারীর ঘরে গিয়ে, তাদের মধ্যে সাত জন দুর্বৃত্তই ওই নারীকে জোরপূর্বক ঘর থেকে তুলে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে নিয়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, ভুক্তভোগী নারী গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন।

ভুক্তভোগী নারী ও তার মেয়ে ৮ জন সেটেলার বাঙালির মধ্যে ৩ জনকে চিনতে পেরেছেন বলে জানা গেছে। তারা হল- (১) মোঃ ইউসুফ (২২), পিতা- মোঃ ইসমাইল, (২) রানা ও (৩) মোশাররফ। তাদের সকলের বাড়ি পাতছড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের নাকাবা রসুলপুর এলাকার কুমিল্লা কলোনিতে বলে জানা গেছে।

ভুক্তভোগী পরিবারের সূত্রে জানা যায়, ২২ আগস্ট রাতে ভুক্তভোগী নারী ও তার এক কিশোরী মেয়ে রাতে বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। বাড়িটি মূল গ্রাম থেকে সামান্য বিচ্ছিন্ন। বাড়ির আশেপাশে সেটেলারদের ফলমূলের বাগান রয়েছে। প্রতিদিন সেটেলাররা তাদের সাথে ঝামেলা বাঁধাতে চাইত। কোনো কোনো সময় তাদের বাড়ির ক্ষেতে গরু-ছাগল বেঁধে দিয়ে যেত। ঐদিন রাত ১১টার দিকে ৮ জনের একদল সেটেলার বাঙালি বাড়িতে ঢুকে মা ও মেয়েকে ঝাপটে ধরে এবং মা ও মেয়েকে আলাদা করে ফেলে। ৭ জন সেটেলার মাকে ধরে জোরপূর্বক বাগানের দিকে নিয়ে যায়। মেয়েটিকে বাড়িতে রেখে দিয়ে তার সাথে মোঃ ইউসুফ নামে একজনকে রেখে যায়। ইউসুফ মেয়েটির মুখে কাপড় বেঁধে দিতে চাইলে, মেয়েটি ধস্তাধস্তি করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

এরপর মেয়েটি কোনোরকমে পার্শ্ববর্তী পৈলাক খাল পার হয়ে তালতলী মূল গ্রামের বাসিন্দাদের খবর দেয়। খবর পেয়ে গ্রামবাসী একতাবদ্ধভাবে এগিয়ে এসে দেখেন মেয়ের মা উস্কোখুস্কো অবস্থায় বাড়িতে অবস্থান করছেন। পরে এলাকাবাসী পুরো বাগান ও বাড়ির আশপাশ এলাকা তন্নতন্ন করে খোঁজেন। তখন দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।

রাঙ্গামাটির বনরূপায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম স্কুলছাত্রী ধর্ষণ চেষ্টার শিকার

গত ২৩ আগস্ট ২০২৪ আনুমানিক বিকাল ৪ টায় রাঙ্গামাটির শহরের ব্যস্ততম বাজার বনরূপা বাজারে মোঃ হাবিবুর রহমান (৫৫) নামে এক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া এক জুম্ম ছাত্রী (৭) ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মোঃ হাবিবুর রহমানের বাড়ি শহরের রিজার্ভ বাজার মুখ এলাকায় বলে জানা গেছে।

স্থানীয়দের সূত্রমতে, সেদিন বিকালে ভুক্তভোগী ছাত্রীটি মায়ের সাথে বনরূপা বাজারে আসে। তার মা বাজারে তরকারি বিক্রি করছিল। এ সময় ছাত্রীটি তার বন্ধুদের সাথে খেলতে খেলতে একটা বিল্ডিংয়ের উপরে উঠে যায়। বিল্ডিংয়ে আগে থেকে অবস্থান করা রাইছ মিয়া ছাত্রীটিকে বিল্ডিংয়ের একটা কক্ষে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালালে ছাত্রীটির বন্ধুরা দেখতে পায়।

তারা চিৎকার করে বাজারের মানুষদের ডেকে নিয়ে আসে এবং লোকজন মো: হাবিবুর রহমানকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। এসময় উত্তেজিত জনতা ধর্ষণের চেষ্টাকারীকে গণধোলাই দেয় এবং পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

নাইক্ষ্যংছড়িতে এক জুম্ম নারী ধর্ষণের চেষ্টার শিকার

বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নে ৯নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিবাহিত এক তঞ্চঙ্গ্যা নারী (৪০) ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ২৩ আগস্ট ২০২৪, শুক্রবার, বিকাল আনুমানিক ৩ টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে জুমে যাওয়ার পথে ওই নারী এক বহিরাগত সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হন বলে জানা গেছে। বহিরাগত সেটেলার বাঙালিটির নাম মো: ফারুক (২৫), পীং- বশর উদ্দিন, গ্রাম- শিকদার বিল, রাজাপালং ইউনিয়ন, উখিয়া উপজেলা, কক্সবাজার জেলা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঐদিন বিকাল আনুমানিক ৩ টার দিকে ওই নারী ঘর থেকে বের হয়ে জুমের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ভালুকিয়া খাল নামক স্থানে পৌঁছলে মো: ফারুক নামের ওই বাঙালি জুম্ম নারীটিকে আটকিয়ে জোরপূর্বক বুকে হাত দেন এবং ধর্ষণের চেষ্টা করেন। এতে ওই নারী ধস্তাধস্তি করে কোনো রকমে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে পাশ্ববর্তী মংজয় পাড়ায় আশ্রয় নিয়ে গ্রামবাসীকে বিষয়টি জানান। এরপর এলাকাবাসী দ্রুত ঘটনাস্থলের দিকে গিয়ে মো: ফারুককে আটক করেন।

নাইক্ষ্যংছড়িতে এক জুম্ম কিশোরী ধর্ষিত হওয়ার অভিযোগ

বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক আদিবাসী জুম্ম কিশোরী (১৫) ধর্ষণের শিকার হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিশোরীর বাড়ি বাইশারী ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের ছাদু অং পাড়া গ্রামে বলে জানা গেছে। এই ঘটনাটি ঘটে গত ১৭ অক্টোবর ২০২৪ আনুমানিক সন্ধ্যা ৬টার দিকে ভুক্তভোগীরই গ্রামে।

ঘটনার পর ভুক্তভোগী কিশোরীর ভাই নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। মামলায় ধর্ষণে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন- মো: সেলিম (২৩), পীং- নুর মোহাম্মদ ও মতিউর রহমান (২৫), পীং- নুরুল হোসেন। তাদের উভয়ের বর্তমান ঠিকানা বাইশারী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের যৌথ খামার এলাকায় বলে জানা গেছে। অভিযুক্তদের মধ্যে মতিউর রহমান গ্রামবাসীদের সহায়তায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, সেদিন ছিল বৌদ্ধদের প্রবারণা পূর্ণিমা উৎসব। তাই বাড়ির লোকেরা সবাই ব্যস্ত ছিলেন। সন্ধ্যা আনুমানিক ৫:৪৫ টার দিকে ওই ভুক্তভোগী কিশোরী হাত-পা ধোওয়ার জন্য সিঁড়ি বেয়ে ছাদু অং খালের দিকে যায়। এসময় মো: সেলিম ও মতিউর রহমান ওই কিশোরীকে অনুসরণ করে। এক পর্যায়ে সন্ধ্যা ৬টার দিকে মতিউর রহমান সিঁড়িতে পাহারা দেয় এবং মো: সেলিম কিশোরীকে জোর করে খালের পাশে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়।

এদিকে বাড়ির লোকজন ভুক্তভোগী কিশোরী বাড়িতে ফিরছে না দেখে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজ করতে শুরু করে। খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে বাড়ির লোকজন খালের পাড়ে বাঁশের ঝোপে কান্নারত অবস্থায় কিশোরীটি খুঁজে পায়। এরপর ভুক্তভোগী কিশোরী তার আত্মীয়-স্বজনকে ধর্ষিত হওয়ার কথা খুলে বলেন। এরপর গ্রামের লোকজন মতিউর রহমানকে আটক করে পুলিশের নিকট খবর দেয় এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মতিউর রহমানকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

সংগঠন সংবাদ

শিক্ষার্থীদের উপর হামলাকারীদের শাস্তি এবং ৫% আদিবাসী কোটা পুনর্বহালের দাবি পিসিপির

গত ১৭ জুলাই ২০২৪ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর হামলার নিন্দা ও জড়িতদের শাস্তির দাবি এবং সরকারি চাকরিতে আদিবাসীদের ৫% কোটা পুনর্বহালের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) একটি বিবৃতি দিয়েছে। পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক অন্বেষ চাকমা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বার্তায় এই বিবৃতির কথা জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে পিসিপি সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হামলার ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ তীব্র নিন্দা ও হামলায় জড়িতদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে এবং সেই সাথে হামলায় নিহত ও আহত শিক্ষার্থীদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

কোটা একটি সাংবিধানিক অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৯ নং অনুচ্ছেদের ৩(ক) তে বলা হয়েছে- 'এই অনুচ্ছেদের যে কোন কিছুই- (ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যকার স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ঘ (১০) এ উল্লেখ আছে- 'চাকরি ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের, সমপর্যায়ের না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার আদিবাসীদের জন্য সরকারি চাকরি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন।

যে কোন দাবিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করা একটি সাংবিধানিক অধিকার। সেই জায়গা থেকে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবিকে আমলে নিয়ে ২০১৮ সালের ন্যায় সকল কোটা বাতিল না করে কোটা ব্যবস্থার যৌক্তিক সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ মনে করে।

আপিল বিভাগের রায় অগ্রহণযোগ্য, আদিবাসীদের জন্য ৫% কোটা পুনর্বহালের দাবি পিসিপির

কোটা সংস্কার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায় অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করে আদিবাসীদের জন্য ৫% কোটা পুনর্বহালের দাবি জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)। গত ২২ জুলাই ২০২৪ পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক অন্বেষ চাকমা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই বিবৃতির কথা জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "গত ২১ জুলাই ২০২৪ তারিখে আপিল বিভাগ ১ম ও ২য় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে সাধারণ আসনে ৯৩%, মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ৫%, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ কোটায় ১% এবং আদিবাসী কোটায় ১% আসন বরাদ্দ করে চূড়ান্ত রায় প্রদান করেন। দেশে বসবাসরত ৫০ টির অধিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য মাত্র ১ শতাংশ কোটা বরাদ্দ রেখে আপিল বিভাগের রায় অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ।

এতে আরও বলা হয়, "বাংলাদেশ বিনির্মাণে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্যই ১ম ও ২য় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে আদিবাসীদের জন্য ন্যূনতম ৫% কোটা পুনর্বহালের জন্য পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ জোর দাবি জানাচ্ছে।"

চট্টগ্রামে পাহাড়ী শ্রমিক ফোরামের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

'আদিবাসী শ্রমিকদের সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত কর', 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়ন কর' শ্লোগান নিয়ে চট্টগ্রামে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের চারটি থানা, চারটি ইউনিট ও আদিবাসী মহিলা ফোরাম চট্টগ্রাম মহানগর শাখার একযোগে বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৯ জুলাই ২০২৪ বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবস্থ বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে এই বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দিসান তঞ্চঙ্গ্যা এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জগৎ জ্যোতি চাকমা। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট নিতাই প্রসাদ ঘোষ, দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট প্রদীপ কুমার চৌধুরী, ঐক্য ন্যাপ চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক অজিত দাশ, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি হ্লামিও মারমা, সহ-সভাপতি সৌরভ চাকমা, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সদস্য অমর কৃষ্ণ চাকমা বাবু এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সুজন চাকমা।

অ্যাড. নিতাই প্রসাদ ঘোষ বলেন, ১৯৭১ সালে যুদ্ধে সকল জাতির অংশগ্রহণ ছিল, কিন্তু বর্তমানে সংখ্যালঘু জনগণের উপর নির্যাতন চরম পর্যায়ে। বর্তমান সরকার ১৫ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অবস্থায়, তবু নির্যাতনের শিকার হচ্ছে সংখ্যালঘুরা। বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে একটি চরম নষ্ট রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সংখ্যালঘু জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বতমান সরকার চুক্তি করেছে কিন্তু বাস্তবায়ন করেনি।

অ্যাড. প্রদীপ কুমার চৌধুরী বলেন, আপনাদের সাথে আমাদের দেখা হয় মিটিং-মিছিলে অধিকার প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে। পাহাড়ের জুম্মরা অস্ত্র ধরেছে। দীর্ঘ বছর পর সরকারের সদিচ্ছায় ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু সেই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য এখনো লড়াই করতে হয়, এতাই সরকারের জন্য লজ্জাকর।

অজিত দাশ বলেন, সরকার সংকট সৃষ্টি করছে, এই সংকটের কারণে ৩৫ জন তাজা প্রাণ গেল। কোটা সংস্কারের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে, সরকার যদি বাস্তবায়ন না করে তাহলে সংগঠিত ভাবে লড়াই সংগ্রাম হবে। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে।

হ্লামিও মারমা বলেন, পাহাড়ের জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদের পাহাড়ের ইতিহাসকে জানতে হবে, চুক্তি পূর্ববর্তী পাহাড়ের জুম্ম জনগণ যে অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল তা জানতে হবে।

প্রথম অধিবেশন শেষে জুম্ম সাংস্কৃতিক শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীদের পরিবেশনায় ৩০ মিনিট সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয় এবং এরপর দ্বিতীয় পর্ব কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কল্প চাকমা এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বন্দর থানা শাখার সহ-সভাপতি জ্যোতিময় তঞ্চঙ্গ্যা ও বন্দর থানা শাখার সভাপতি সুজন চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সন্তোষ বিকাশ চাকমা।

এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সিনিয়র সহ-সভাপতি অনিল বিকাশ চাকমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জগৎ জ্যোতি চাকমা, নারী বিষয়ক সম্পাদক শ্রীমতী সোনাবী চাকমা।

এতে স্ব স্ব সাংগঠনিক অবস্থা নিয়ে বক্তব্য রাখেন চান্দগাও থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক স্বপন খীসা, টেকবার ইউনিট শাখা সাংগঠনিক সম্পাদক যতন ত্রিপুরা, মাইল্যা মাথা ইউনিট শাখার সাধারণ সম্পাদক স্বপন চাকমা, নিউমুড়িং ইউনিট

শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মিঠন চাকমা, ইপিজেড থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুজন চাকমা, বন্দর থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অমর চাকমা, পতেঙ্গা থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক শ্যামল ত্রিপুরা ও আদিবাসী মহিলা ফোরাম এর সভাপতি চিজিপুতি চাকমা।

সবশেষে বন্দর, ইপিজেড, পতেঙ্গা ও চান্দগাও থানা ও মাইল্যার মাথা, নিউমুড়িং, বোর্ড স্কুল ও টেক বাজার ইউনিট কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দিসান তঞ্চঙ্গ্যা এবং আদিবাসী মহিলা ফোরাম চট্টগ্রাম মহানগর শাখাকে শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনের নারী বিষয়ক সম্পাদক শ্রীমতী সোনাবী চাকমা।

নবাগত কমিটির সকল সদস্যদের শুভেচ্ছা জানান বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের কেন্দ্রীয় নেতা এস জে চাকমা।

ইউপিডিএফ কর্তৃক এইচডব্লিউএফের দুই নেত্রী অপহরণে এইচডাব্লিউএফ ও পিসিপি'র নিন্দা

গত ৭ আগস্ট ২০২৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ (প্রসীত গ্রুপ) এর সন্ত্রাসী কর্তৃক হিল উইমেন্স ফেডারেশনের দুই নেত্রীকে অপহরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং দ্রুত নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে যৌথ বিবৃতি দিয়েছে হিল ইউমেন্স ফেডারেশন (এইচডব্লিউএফ) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)।

পিসিপি'র তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক অন্বেষ চাকমা স্বাক্ষরিত প্রেস বার্তায় বলা হয় যে, গত ৬ আগস্ট ২০২৪ খ্রিঃ রাঙ্গামাটি সদরস্থ ভেদভেদীর টিভি কেন্দ্র এলাকা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ (প্রসীত গ্রুপ) এর সন্ত্রাসী কর্তৃক হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুষ্টি চাকমা এবং একই শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক কাঞ্চনমালা চাকমাকে অস্ত্রে মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

বিকাল আনুমানিক ২:০০ ঘটিকার সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ (প্রসীত গ্রুপ) রাঙ্গামাটি শহরে সহিংসতা ও নাশকতা সৃষ্টির অপচেষ্টার হীন উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র, ইট, গুলতি, লাঠিসোটা নিয়ে মানিকছড়ি-রাঙ্গামাটি এবং রাজবাড়ি-শিল্পকলা একাডেমি এলাকা হয়ে দুইদিক থেকে প্রবেশ করে রাঙ্গামাটি শহরের জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে কথিত গণসমাবেশ করার ঘোষণা দেয়। এ উদ্দেশ্যে রাঙ্গামাটি জেলাস্থ কাউখালী, ঘাগড়া, কুতুকছড়ি, সাপছড়ি, নান্যাচর, বন্দুকভাঙ্গা প্রভৃতি এলাকা থেকে কয়েক হাজার সাধারণ জনগণকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ১০টির অধিক জীপ গাড়ি ও ১৫টির অধিক ট্রলার বোট নিয়ে রাঙ্গামাটি শহরে প্রবেশ করতে থাকে। রাঙ্গামাটি শহরে স্থিতিশীলতা রক্ষা ও জুম্ম জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে পিসিপি ও এইচডব্লিউএফ তাদেরকে স্ব স্ব এলাকায় ফিরে যাওয়ায় আহ্বান জানায়।

কিন্তু এ আহ্বান উপেক্ষা করে মানিকছড়ি থেকে সেনাবাহিনীর তিনটি গাড়ির সহযোগিতায় শহরে প্রবেশ করার সময় পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফের দুইটি টিমের উপর জীপ ও ট্রলার থেকে অনবরতভাবে ইট-গুলতি নিক্ষেপ করতে থাকে এবং যানবাহন

থেকে নেমে লাঠিসোটা নিয়ে হামলা করতে থাকে। এ সময় অস্ত্রের মুখে এইচডব্লিউএফের দুই নেত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং অপরাপর কর্মীদের হামলা করলে যুব সমিতি, পিসিপি ও এইচডব্লিউএফের ২০ জনের অধিক নেতাকর্মী আহত হন এবং তারমধ্যে ১৭ জন কর্মী রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিতে বাধ্য হয়।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন মনে করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণেই রাষ্ট্রের বিশেষ মহলের সহযোগিতায় চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ প্রসীতপন্থী সাম্প্রতিক সময়ে মাথাছাড়া দিয়ে উঠেছে এবং রাঙ্গামাটি শহর অস্থিতিশীল করার পায়তারা চালাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সামগ্রিকভাবে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য অতিদ্রুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন আবারও দুই নেত্রীকে অতিদ্রুত নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছে পিসিপি ও এইচডব্লিউএফ।

ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহৃতদের নির্যাতন ও শ্লীলতাহানির নিন্দা এইচডাব্লিউএফের

পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ (প্রসীত গ্রুপ) সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহৃত দুইজন নেত্রী মুক্ত হওয়ার খবর জানিয়ে এবং সন্ত্রাসীদের কর্তৃক দুই নেত্রীকে কাপুরুষোচিত নির্যাতন ও শ্লীলতাহানির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ)।

বিবৃতিতে অবিলম্বে এইসব গণবিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার জন্য ছাত্র-যুব সমাজসহ সচেতন জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয় এবং পার্বত্য এলাকায় শান্তি ও পার্বত্য চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের স্বার্থে এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের নিকট দাবি জানানো হয়।

গত ১০ আগস্ট সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক চন্দ্রিকা চাকমা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বার্তায় এই বিবৃতি দানের কথা জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ছাত্র-জনসাধারণ ও সুশীল সমাজের ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে ও চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে অবশেষে অপহরণের দুইদিন পর গত ০৮ আগস্ট ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ কুতুকছড়ি এলাকা থেকে অপহৃত দুই নেত্রীকে ছেড়ে দেয় সন্ত্রাসীরা।

শিমুলতলী এলাকার প্রত্যক্ষদর্শী এলাকাবাসী ও অপহরণের শিকার হওয়া দুই নেত্রীর বক্তব্য মোতাবেক, শিমুলতলী এলাকাতে শুধু কাঞ্চনা চাকমাকেই ২০-৩০ জন ইউপিডিএফের পুরুষ সন্ত্রাসী জনসমক্ষে ইট, লাঠি, ধারালো অস্ত্র দিয়ে বেধড়ক আঘাত করে। এসময় সন্ত্রাসীরা পাশবিক কায়দায় ভুক্তভোগীর পেটে, পাছায়, বুকে পা দিয়ে আঘাত করে, এমনকি পরিধান করা কাপড় খুলে দিয়ে পিঠে আঘাত করে। পায়ে পড়েও সন্ত্রাসীদের বর্বর আক্রমণ হতে রক্ষা পায়নি কাঞ্চনমালা চাকমা। কাঞ্চনমালা চাকমাকে অজ্ঞান অবস্থায় গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়।

সুষ্টি চাকমাকেও ১০-১২ জন শুধু পুরুষ ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী উপর্যুপরি আঘাত করেছে। ইট, লাঠি, কাঠ দিয়ে মাথায়সহ পুরো শরীরে আঘাত করে। উভয়ের শরীরের স্পর্শকাতর অংশেও আঘাত করেছে তারা।

সন্ত্রাসীরা মারাত্মক জখম অবস্থায় অপহৃতদের মানিকছড়ি-ঘাগড়া পার হয়ে কাউখালীর গহীন অঞ্চলে নিয়ে যায়। অপহরণ ঘটনাটি দ্রুত জানাজানি ও ব্যাপক প্রতিবাদ হলে তারা সেখান থেকে কুতুকছড়িতে নিয়ে আসে এবং সেখানে অপহৃত উভয়কে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়। এরপর গত ৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখ জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে কুতুকছড়ি এলাকা থেকে সংগঠনের কাছে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয় সন্ত্রাসীরা।

শুধু তাই নয়, সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদকসহ ৬ জন নারীকে বেদড়ক মারধর করে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা। সন্ত্রাসীরা দুই নারীকে অপহরণ করতে সক্ষম হলেও বাকিরা কোনোরকম প্রাণ নিয়ে ফিরে আসেন।

বান্দরবানে জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজের বিক্ষোভ: আদিবাসী স্বীকৃতি, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যে গ্রাফীটি অংকনে বাধা দেওয়া ও মুছে দেওয়ার প্রতিবাদে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ দেশের আদিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান ও পার্বত্য চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিতে বান্দরবান পার্বত্য জেলা সদরে জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজের উদ্যোগে ২১ আগস্ট ২০২৪ এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাবেশ থেকে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্দেশ্যে ৭ দফা দাবি জানানো হয়, সেগুলি হল- (ক) পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। (খ) আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। (গ) গ্রাফীটি আঁকার স্বাধীনতা দিতে হবে। (ঘ) বম জনগোষ্ঠী ও পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজবন্দী নারী, শিশু সহ

সকলকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। (ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি অধিকার আইন নিশ্চিত করতে হবে। (চ) ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন নিয়ে ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে হবে। (ছ) পর্যটনের নামে ভূমি বেদখল বন্ধ করতে হবে।

'বৈষম্য বিরোধী আদিবাসী ছাত্র সমাজ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা' এর ব্যানারে এই বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও গণসঙ্গীতের আয়োজন করা হয়। বিকাল ৩টায়, প্রথমে পুরান রাজার মাঠ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ পড়ুয়া জুম্ম ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতীদের একটি বিরাট বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বান্দরবান প্রেস ক্লাবে এসে সমাপ্ত হয়। এরপর সেখানেই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সেখান থেকে গণসঙ্গীত গেয়ে গেয়ে বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা বড় রাজার মাঠে এসে তাদের কর্মসূচি শেষ করেন।

সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি জন ত্রিপুরা, বম জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি জেমস বম, মারমা জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও গ্রীন ভয়েস পার্বত্য চট্টগ্রাম এর প্রধান সমন্বয়ক সাচিংনু মারমা, ছাত্রদের পক্ষ থেকে মংচশৈ মারমা, অং অং মারমা প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সরকার যদি এই পার্বত্য চট্টগ্রামকে সমগ্র বাংলাদেশের সাথে সংহত করতে চায় তাহলে এই আদিবাসী স্বীকৃতি দিতে হবে। দেশের জীবনধারায় আমাদেরকে যদি যুক্ত করতে চায়, তাহলে আমাদের অধিকার আমাদের দিতে হবে। আমরা বেশি কিছু চাই না, আমরা শুধু নিজেদের মত করে বাঁচতে চাই।

বক্তারা আরো বলেন, কুকি-চিন নামে এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সন্ত্রাসী হতে পারে, কিন্তু গোটা বম জাতি সন্ত্রাসী নয়। কিন্তু গোটা বম জাতিকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে নিরীহ বম নারী-পুরুষদের নির্যাতন করা হচ্ছে, হত্যা করা হচ্ছে। তা হতে দেওয়া যাবে না। নিরীহ বম নারী-পুরুষ যাদেরকে আজ জেলে বন্দী রাখা হয়েছে, তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। বক্তারা বলেন, বান্দরবানে আজ যে অরাজকতা করা হচ্ছে তার পেছনে কারা জড়িত সেটা সঠিক তদন্ত করে তাদেরকে যেন শাস্তির আওতায় আনা হয়।

পার্বত্য জেলায় জুম্ম নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফের বিক্ষোভ

তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন স্থানে বিগত ২২ ও ২৩ আগস্ট ২০২৪ বহিরাগত সেটেলার বাঙালি কর্তৃক পরপর তিন জুম্ম নারী ও শিশুকে যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ) গত ২৪ আগস্ট ২০২৪, শনিবার, রাঙ্গামাটিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। পাশাপাশি একই কারণে খাগড়াছড়ি জেলা শহরেও জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

সকাল ১০ টার দিকে রাঙ্গামাটিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দক্ষিণ ফটকে পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে খাগড়াছড়ির রামগড়ে এক জুম্ম নারীকে সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণকারী সেটেলারদের, রাঙ্গামাটির বনরূপায় দ্বিতীয় শ্রেণির এক জুম্ম ছাত্রীকে ধর্ষণ

চেষ্টাকারী মো: হাবিবুর রহমান এবং বান্দরবানে নাইক্ষ্যংছড়িতে এক জুম্ম নারীকে ধর্ষণ চেষ্টাকারী মো: ফারুককে অতিদ্রুত গ্রেপ্তারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ সঞ্চালনা করেন পিসিপির জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন চাকমা ও সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির অর্থ সম্পাদক হিরা চাকমা। উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, পিসিপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক অন্তর চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক উলিচিং মারমা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা বলেন, দেশের বর্তমান বন্যা পরিস্থিতিতে যেখানে মানুষ সর্বহারা উদ্বাস্তু, সে জায়গায় পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় তিনটি ধর্ষণের ঘটনা সত্যিই নিন্দনীয়। সাম্প্রতিক সময়ে ছাত্র -জনতার গণঅভ্যুত্থানের ফলে ফ্যাসিবাদী সরকার পতনের পর বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে আমাদেরর প্রত্যাশা বৈষম্যহীন সুষ্ঠু রাষ্ট্রের।

এই যুব নেতা সুমিত্র চাকমা আরো বলেন, এই ধরনের ঘটনার থেকে প্রশ্ন জাগে পার্বত্য চট্টগ্রামে কি আবারও সাম্প্রদায়িক শক্তি জেগে উঠছে কিনা? যদি জেগে উঠে তাহলে এই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নির্মূল করতে হবে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য তরুণ জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহবান জানান। সেই সাথে নবগঠিত সরকারের কাছে তিনটি সংঘটিত ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চান।

পিসিপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক অন্তত চাকমা বলেন, অতীতের ন্যায় বলতে হয় ধর্ষকদের সুষ্ঠু বিচার না হওয়ায় তারা প্রতিনিয়ত এহেন ঘটনা ঘটানোর সাহস পাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ রাষ্ট্রেরও অংশ। তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচারহীনতার সংস্কৃতি দূরীকরণে বিশেষ দৃষ্টি আরোপ করার দাবি জানান। এই অন্যায় ও ধর্ষকদের সুষ্ঠু বিচার করা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাগ্রত ছাত্র সমাজ বসে থাকবে না বলে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক উলিচিং মারমা বলেন, দেশের একদিকে মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত, অন্যদিকে পাহাড়ে চলছে ধর্ষণের ঘটনা। ছাত্র-জনতার যে গণঅভ্যুত্থান তার মধ্য দিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক বৈষম্যহীন যে রাষ্ট্র গঠন হওয়ার কথা তার সুফল পাহাড়বাসীরাও আশা করে। কিন্তু অল্প কদিনে পাহাড়ের মানুষ টের পেয়েছে। ঘটে যাওয়া তিনটি ঘটনা প্রমাণ করে, আজও জুম্ম নারীরা নিরাপদ নয়। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীর নিরাপত্তা এবং জনমানুষের নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানান।

সভাপতির বক্তব্যে হিরা চাকমা তিন জেলায় তিনটি সংঘটিত ধর্ষণ ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের দাবি ও পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও পরবর্তী প্রতিবাদ সমাবেশ সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিচারহীনতার অপসংস্কৃতির কারণে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে: ঢাকায় পিসিপি'র সমাবেশে বক্তাগণ

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার এক নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ এবং রাঙ্গামাটিতে দ্বিতীয় শ্রেণির এক বালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টায় জড়িতদের বিচারের দাবিতে গত ২৪ আগস্ট ২০২৪ রাজধানীর শাহবাগে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ করা হয়।

অনন্ত তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় উক্ত মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন পিসিপির ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি জগদীশ চাকমা, বাগাছাসের (বাংলাদেশ গারো ছাত্র সংসদ) ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি জনজেত্রা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন শুভ, সংখ্যালঘু অধিকার আন্দোলনের প্রতিনিধি অন্তু রায় ও সুকান্ত বর্মণ। এছাড়াও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি পাহাড়ী শিক্ষার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সৈসানু মারমা তার বক্তব্যে ২২ ও ২৩ আগস্টে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে ঘটা ধর্ষণের তীব্র নিন্দা জানান ও অভিযুক্তদের দ্রুত বিচারের দাবি জানান। তিনি আরও বলেন, "জুম্ম তরুণরা জেগে উঠেছে। তারা তাদের দাবি আদায়ে রাজপথে নেমে এসেছে। ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বরে করা পার্বত্য শান্তিচুক্তি যথাযথ বাস্তবায়িত হলে পাহাড়ীরা অধিকার ফিরে পাবে"। বক্তব্যের শেষে তিনি খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে ঘটা ধর্ষণের অভিযুক্তদেও গ্রেপ্তার করার দাবি জানান।

সৈসানু মারমার মত ধর্ষণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও অভিযুক্তদের প্রচলিত আইনে শাস্তির দাবি করে বাগাছাসের ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি জন জেত্রা বলেন, "বন্যাকবলিত এলাকায় ধর্ষণের ঘটনা খুবই দুঃখজনক ও হতাশার"। এ ব্যাপারে তিনি আইন উপদেষ্টার অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুলের হস্তক্ষেপ কামনা করেন যাতে ধর্ষকদের আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হয়।

সংখ্যালঘু অধিকার আন্দোলনের প্রতিনিধি অন্তু রায় ও সুকান্ত বর্মণ আজকের প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিলে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

রাঙ্গামাটিতে এম এন লারমার জন্মবার্ষিকীতে কবিতা পাঠ ও আলোচনা সভা

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে রাঙ্গামাটি জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে কবিতা পাঠ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ম্রানুচিং মারমার সঞ্চালনায় শান্তি দেবী তঞ্চঙ্গ্যার সভাপতিত্বে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি ও সাহিত্যিক শিশির চাকমা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য অ্যাডভোকেট চঞ্চু চাকমা।

আলোচনা সভার শুরুতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক উওয়াই নু মারমা। উল্লেখ্য, ১৫ সেপ্টেম্বর সাবেক গণপরিষদ ও সংসদ সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত এম এন লারমার ৮৫তম জন্মবার্ষিকী।

কবি ও সাহিত্যিক শিশির চাকমা বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নব্য বাংলাদেশে শাসনব্যবস্থা প্রণয়নে কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংসদের ভেতরে-বাইরে কথা বলেছেন। তিনি পাহড়ের জুম্ম জনগণের আত্মপরিচয়ের দাবি বারবার শাসকগোষ্ঠীর কাছে তুলে ধরেছেন। শেষ পর্যন্ত কর্তৃত্ববাদী শাসক তাঁর ন্যায্য ও যৌক্তিক দাবি মেনে না নিলে তিনি অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় যেতে বাধ্য হন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্যোগকে স্বাগত

জানিয়ে তিনি বলেন, এখন একটা সুযোগ এসেছে নতুন রাষ্ট্র সংস্কার ও সংবিধান পুনর্লিখনে ১৯৭২ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার চিন্তা প্রতিফলিত এবং প্রোথিত করার।

আলোচকের বক্তব্যে অ্যাডভোকেট চঞ্চু চাকমা বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে জানা ও অধ্যয়ন করা খুবই জরুরি। তিনি কে? নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর সংগ্রাম জানা দরকার। তাঁর সংসদীয় বক্তব্যগুলো আলোচনা এবং তা মানুষের মাঝে পৌঁছে দেয়া দরকার। তিনি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রদর্শিত আদর্শ ধারণ করে চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহবান জানান।

ঢাকায় বিপ্লবী এম এন লারমার জন্মবার্ষিকী পালিত

পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার মিলনায়তনে বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটি কর্তৃক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক ও কলামিস্ট আবু সাঈদ খানের সভাপতিত্বে এবং আদিবাসীদের অনলাইনভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আইপিনিউজ এর উপ-সম্পাদক সতেজ চাকমার সঞ্চালনায় আলোচনা সভার শুরুতে গণঅভ্যুত্থান, রাষ্ট্র সংস্কার ও সংবিধান বিতর্ক: মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জরুরি জিজ্ঞাসা শীর্ষক এক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন লেখক ও গবেষক পাভেল পার্থ।

প্রবন্ধে রাষ্ট্র সংস্কার ও সংবিধান তৈরীতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ভূমিকা নিয়ে আলোকপাত করা হয়। প্রবন্ধে বলা হয়, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সংবিধান সংস্কারের প্রশ্নে বিপ্লবী লারমার ১৯৭২ সালের গণপরিষদ বিতর্ক একটি অবশ্য পাঠ্য বিষয়। তিনি এমন একটি দেশের স্বপ্ন বুনেছিলেন যেখানে সকল শ্রেণি, সকল সম্প্রদায়, সকল জাতিগোষ্ঠী সমমর্যাদায় বসবাস করবে। সে লক্ষ্যে সংবিধানে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রবল জাত্যাভিমানী জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় ও জাতীয়তার প্রশ্নে গণপরিষদের সংবিধান বিতর্কে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কর্তৃত্ববাদী জাতীয়তাবাদ কর্তৃক তাঁকে সেদিন প্রবলভাবে অবজ্ঞার শিকার হতে হয়েছিল। তবুও তিনি সর্বদা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক স্নিগ্ধা রেজওয়ানা তার আলোচনায় বলেন, এম এন লারমা একজন দূরদর্শী নেতা ছিলেন। আজকের বিশ্বে জাতিসংঘের ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অর্জনে কাউকে পেছনে না ফেলে সকলকে সাথে নিয়ে এগিয়ে চলার যে আহ্বান জানানো হচ্ছে সেটি প্রয়াত লারমা ৪০-৫০ বছর আগে বলে

গিয়েছিলেন। তিনি বিনাসি উন্নয়ন নিয়ে কথা বলেছিলেন, কথা বলেছেন নারী অধিকার নিয়ে, নিম্নবর্গের মানুষদের নিয়ে। শুধু তাই নয়, তিনি সংবিধানে ঘুষখোর, দুর্নীতিপরায়ণদের বিরুদ্ধে নীতি গ্রহণের কথা বলেছিলেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও লেখক আলতাফ পারভেজ বলেন, "আমার দৃষ্টিতে সংবিধান সংস্কারের রাজনীতিতে মাস্টারমাইন্ড দু'জন। তাঁর মধ্যে একজন হলে বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতেও ছিলেন এবং একজন বিপ্লবী। আমি একটি পান্ডুলিপি তৈরি করেছি তাঁকে নিয়ে যেটা এখনও প্রকাশিত হয়নি। সেটার নাম দিয়েছি 'ফার্স্ট ডেমোক্র্যাট" অর্থাৎ, বাংলাদেশের প্রথম গণতন্ত্রী। সংবিধান বিতর্কের সময় তিনি যে বিতর্কগুলো করেছিলেন সেগুলোই মূলত তার প্রমাণ যেটা আজকের আলোচনার মধ্যে মোটামুটি উঠে এসেছে।"

আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যরিস্টার সারা হোসেন বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সংবিধান বিতর্কের সময় যে চিন্তাগুলো তুলে ধরেছিলেন সেগুলো মূলত বাংলাদেশকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক দেশ করার জন্য। কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়ন করা হয়নি। একই সাথে প্রতিবছর আমরা পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়েও কথা বলি। কিন্তু সে চুক্তির অধিকার বিষয়ই সমাধান করা হয়নি আজ অবধি।

সভাপ্রধানের বক্তব্যে বিশিষ্ট কলামিস্ট ও সাংবাদিক আবু সাঈদ খান বলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্র মুসলমান রাষ্ট্র ছিল। আমরা বলেছি এটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। কাজেই মুসলমান রাষ্ট্র যদি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হয় তবে বাঙালির রাষ্ট্রও সাম্প্রদায়িক। কেননা, এখানে আরো চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সান্তাল, ওরাওসহ বিভিন্ন জাতির মানুষ বাস করেন। আমরা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র করতে চাইনি। একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ কেবল বাঙালি করেনি। সেখানে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাও, গারো, মুনিপুরি অংশ নিয়েছিল। কাজেই আমাদের সকলের রাষ্ট্র হওয়ার কথা ছিল।

সংবিধান সংস্কারের প্রশ্নে বিপ্লবী লারমার ১৯৭২ সালের গণপরিষদ বিতর্ক অবশ্য একটি পাঠ্য বিষয় বলে ঢাকায় বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

আলোচনায় আরো অংশ নেন লেখক ও এক্টিভিস্ট সারোয়ার তুষার, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এর ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক হরেন্দ্র নাথ সিং।

রাঙ্গামাটিতে এম এন লারমার জন্মবার্ষিকীতে আলোচনা সভা

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সকালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি ডা. গঙ্গামানিক চাকমা।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও সাংস্কৃতিককর্মী শিশির চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী ফোরামের আহ্বায়ক প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্কের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ভবতোষ দেওয়ান।

সভায় ঊষাতন তালুকদার বলেন, "অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশ সংস্কারের জন্য বিভিন্ন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। কিন্তু

পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে আশান্বিত হওয়ার মতো কোনো পদক্ষেপ আমাদের চোখে পড়েনি। চুক্তি স্বাক্ষরের দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও কোনো সরকারই চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিকতা দেখায়নি। তাই এই সরকারের কাছে দাবি থাকবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। যাতে পাহাড়ে মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারে। সংবিধানে পাহাড়ের মানুষের বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। অতীতের মতো পাহাড়ের জনগণ যাতে বঞ্চিত না হয় এবং পাহাড়ের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখার আহ্বান রইল।

এসময় আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন আদিবাসী ফোরামের সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি ডা: কনিষ্ক চাকমা, বিশিষ্ট শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শিশির চাকমা, সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্কের সহ-সভাপতি অ্যাড. ভবতোষ দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রাম হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক উইলোচিং মারমা।

বক্তারা বলেন, এম এন লারমা শুধু পাহাড়ের নেতা ছিলেন না। তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানব জাতির কল্যাণে কাজ করে গেছেন। আমাদের উচিত তাঁর জীবন দর্শন মেনে চলা। তিনি পাহাড়ের মানুষের জন্য অনেক কিছু করে গিয়েছেন। অনেক কিছু করার পরিকল্পনা ছিলো। তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন জন্য আমাদের কাজ করে যেতে হবে।

এম এন লারমার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রামে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের চট্টগ্রাম অঞ্চল এর উদ্যোগে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, রবিবার, বিকাল ৪:৩০ টায়, চট্টগ্রামের স্টেশন রোডের এশিয়ান এস আর হোটেলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য সাধুরাম ত্রিপুরা মিল্টন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক রনজিৎ কুমার দে, ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশন, চট্টগ্রাম এর সাবেক চেয়ারম্যান প্রকৌশলী দেলোয়ার মজুমদার, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা এর সভাপতি তাপস হোড়, ঐক্য ন্যাপ, চট্টগ্রাম এর যুগ্ম সম্পাদক পাহাড়ী ভট্টাচার্য, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর এর সভাপতি হ্লামিউ মারমা প্রমুখ।

বাঘাইছড়িতে এম এন লারমার ৮৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা

গত ১৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯ টার দিকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার ৩২ নং বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের উগলছড়ি মুখ (বটতলা) কমিউনিটি সেন্টারে মহান বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার (এম এন লারমা) ৮৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির

ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক বাবু সুব্রত চাকমার সভাপতিত্বে এবং পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক চিবরন চাকমার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি উৎপলাক্ষ চাকমা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি লক্ষীমালা চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি পিয়েল চাকমা, ৩১ নং খেদারমারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বাবু বিল্টু চাকমা, বাঘাইছড়ির সুশীল সমাজের প্রতিনিধির পক্ষে অলিভ চাকমা ও হেডম্যান প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ চাকমা প্রমুখ।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উৎপলাক্ষ চাকমা বলেন, জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা একটি সঠিক আদর্শের নাম। যে আদর্শের কোনো মোহ নেই, লোভ নেই, ব্যক্তিস্বার্থ নেই। যে আদর্শ মানুষকে সঠিক পথে চলতে শেখায়, সঠিক পথে থাকতে শেখায় এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে শেখায়। তিনি আরো বলেন, আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের জন্য এম এন লারমা একসময় যে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন, আমাদের প্রজন্মকেও তাঁর সেই মহান আদর্শে উজ্জীবিত করে সে পথেই ধাবিত করতে হবে। তা না হলে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি পিয়েল চাকমা বলেন, আমাদের পাহাড়ের আদিবাসীদের অস্তিত্ব আজ চরম হুমকির মুখে। গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশ থেকে এক ফ্যাসিবাদী স্বৈরশাসক বিদায় হলেও পাহাড়ে কিন্তু সেই বীজ এখনো থেকে গেছে। আর সেটা এমনিতেই যাবে না। আমাদেরকেই সেই বীজ সমূলে উৎপাটন করতে হবে। তিনি জুম্ম তারুণ্যের প্রতি আহ্বান রেখে জানান, মহান অবিসংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আমাদের শিখিয়ে গেছেন লড়াই করে বাঁচতে হবে। যে জাতি বেঁচে থাকার লড়াই করতে পারে না, সে জাতির পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার থাকতে পারে না। আমাদেরকেও এম এন লারমার নির্দেশিত সে পথেই এগোতে হবে। আর এই গুরুদায়িত্বটা আমাদের জুম্ম তরুণ প্রজন্ম, তরুণ শক্তিকে কাঁধে নিতে হবে।

বাঘাইছড়ির সুশীল সমাজের প্রতিনিধির পক্ষে বাবু অলিভ চাকমা বলেন, এম এন লারমা শুধুমাত্র জনসংহতি সমিতির নেতা নয় এবং তিনি শুধুমাত্র পাহাড়ের আদিবাসীদেরও নেতা নয়, এম এন লারমা হচ্ছেন একজন জাতীয় পর্যায়ের নেতা। তিনি সারাবিশ্বের নিপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত গণমানুষের নেতা। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে তাঁর সংসদ জীবনের বক্তৃতাগুলো অধ্যায়ন করলে এর কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। পাহাড়ের প্রতিটি অধিকার সচেতন, শিক্ষিত জুম্মের তাঁর সেই মহান আদর্শকে বুকে ধারণ করে এগিয়ে চলা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

সবশেষে সভাপতির বক্তব্যের মাধ্যমে আলোচনা সভাটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সদস্য বাবু মন্টু বিকাশ চাকমা।

মহান শিক্ষা দিবসে চট্টগ্রামে পিসিপি'র ছাত্র সমাবেশ ও মিছিল

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বিকাল ৩:৩০ ঘটিকায় উক্ত ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সকল প্রকার সরকারী চাকরিতে ও দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫% শিক্ষা কোটা চালু করা এবং সকল আদিবাসী মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিতে চট্টগ্রামে চেরাগী পাহাড় মোড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যৌথ উদ্যোগে ছাত্র সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ছাত্র সমাবেশে পিসিপি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুভাষ চাকমার সঞ্চালনায় চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি হ্লামিও মারমা'র সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পিসিপি চবি শাখার সভাপতি অন্তর চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সুদীপ্ত চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের চট্টগ্রাম জেলা সংসদের সভাপতি টিকলু দে, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি অশোক সাহা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার অর্থ সম্পাদক উকিংসাই মারমা।

উকিং সাই মারমা বলেন, পাহাড়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রে শিক্ষার অবকাঠামোকে ধ্বংস করে রাখা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষকের চরম সংকটের ফলে আদিবাসী শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আদিবাসীদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে ৫% আদিবাসী কোটা পূর্ণবহাল রাখাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করার দাবি জানান তিনি।

সুদীপ্ত চাকমা বলেন, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বাণিজ্যিকীকরণ করে শিক্ষা ব্যবস্যা করা হচ্ছে। যে দেশের ছাত্ররা নিজের মাতৃভাষা রক্ষার জন্য জীবন দিয়েছিল সেই দেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভিন্ন ভাষাভাষী ১৪টি জাতিগোষ্ঠী নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার বৈষম্যকে দূরীকরণ করে সুষ্ঠু গণমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং আদিবাসীদের সরকারি চাকরিতে ৫% কোটা পূর্ণবহালের দাবী জানান।

টিকলু দে বলেন, পাহাড়ে আদিবাসীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও অনেক পিছিয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে ভয়াবহ দূরাবস্থা দেখে বোঝা যায় সেখানকার আদিবাসীরা সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত। আজ ৬২তম শিক্ষা দিবসে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে দাবী জানাই শিক্ষা বৈষম্য দূর করে আদিবাসীদের সরকারি চাকরিতে ৫% কোটা নিশ্চিত করে স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্তর চাকমা বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছর অতিক্রান্ত হলেও শিক্ষাকে একটি গণমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক ও অসাম্প্রদায়িক করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুরাবস্থার মধ্য দিয়ে রাখা হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে আদিবাসীরা সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় সেখানে আদিবাসীদের অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবি জানাই।

অশোক সাহা বলেন, বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে। পাহাড়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করে আদিবাসীদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে। মানবিক বাংলাদেশ গড়তে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে স্ব স্ব অধিকর নিশ্চিত করতে হবে।

হ্লামিও মারমা'র সভাপতিত্বে ছাত্র সমাবেশ শেষে চেরাগী পাহাড় মোড় হতে মিছিল বের হয়ে প্রেসক্লাব প্রদক্ষিণ করে চেরাগী মোড়ে এসে সমাপ্ত হয়।

খাগড়াছড়িতে জুম্মদের উপর হামলার প্রতিবাদে ঢাবি'তে বিক্ষোভ সমাবেশ

খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক সোহেল রানা কর্তৃক জুম্ম ছাত্রী ধর্ষণ ঘটনায় জুম্মদের উপর সেটেলারদের সাম্প্রদায়িক হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে আজ ২ অক্টোবর ২০২৪ পাহাড়ের নিপীড়িত ছাত্র জনতার উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য পাদদেশে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী কুর্ণিকোভা চাকমা বলেন, আমরা আদিবাসীরা শান্তি চাই, আমরা আমাদের মৌলিক অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই, আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিন। তিনি সোহেল রানা নামক এক ধর্ষকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পাহাড়ি মানুষদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার নিন্দা জানান এবং হামলাকারীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগরের সাংগঠনিক সম্পাদক রুবেল চাকমা তার বক্তব্যে বলেন, কয়েকদিন আগেও সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা নিয়ে আমরা রাজু ভাস্কর্যে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। কয়েকদিন যেতে না যেতেই আবারো সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার পাহাড়ের আদিবাসী মানুষ। তিনি বলেন, পার্বত্য এলাকায় সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন সর্বদা পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করে। এ ধরনের প্রশাসন আমরা চাই না। তিনি বলেন, পাহাড়ের মানুষেরা এখনও অবধি শান্তির পথে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট রয়েছে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী মানুষ অধিকার আদায়ে কী করতে পারে তা আপনারা অতীতে দেখেছেন এবং ভবিষ্যতেও এরকম অবস্থা হলে নিপীড়িত ছাত্র জনতা রক্ত দিতেও পিছপা হবে না।

বাংলাদেশ বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক রিপন বড়ুয়া বলেন, পাহাড়ের আদিবাসী বন্ধুরাও সক্রিয়ভাবে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। তবে কেন পাহাড়ে এত বৈষম্য। সমতলে যারা নানা অপরাধী কর্মকান্ডে জড়িত সেসব কুলাঙ্গারদেরকে কেন পার্বত্য চট্টগ্রামে বদলী করা হবে? তাহলে কি পাহাড়কে পানিশমেন্ট জোন হিসেবে বিবেচনা করা হয়? তিনি আরো বলেন, যে গৌতম বুদ্ধ

আজীবন অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন আজকে তার মূর্তি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। শান্তিপ্রিয় পাহাড়ী মানুষদেরকে বারবার হামলা করা হচ্ছে। তিনি ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঘটনার দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দীন শুভ সমাবেশের সাথে সংহতি এবং ঘটনার দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে বলেন, দেশের এ সময়ের অস্থিতিশীল পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ঘটনার জন্ম দিচ্ছে। তিনি প্রশাসনকে প্রশ্ন করে বলেন, যে ব্যক্তির নামে ইতিমধ্যেই ২টি ধর্ষণের মামলা রয়েছে, সে কিভাবে আবারো শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পায়? তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যে আশা ও প্রত্যাশা নিয়ে জনগণ আপনাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়েছে সে আকাঙ্ক্ষার যথার্থ প্রতিফলন ঘটান। তিনি পাহাড় এবং সমতলের সকল মেহনতি মানুষের সংগ্রাম-সংকটে ছাত্র ইউনিয়ন পাশে থাকবে বলেও ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের সভাপতি এন্টনি রেমা বলেন, বাংলাদেশ নামক এ ভূখন্ডে বাঙালি ছাড়াও ৫৪ টির অধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। এ আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবসময় সম্পৃক্ত হতে চায়। কিন্তু এ রাষ্ট্রযন্ত্র এ জনগোষ্ঠীদের সর্বদা বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা করছে। যার ফলে জন্য প্রতিনিয়ত তাদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আদিবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও রাষ্ট্র সংস্কারের একটি অংশ। সুতরাং আদিবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ অবিলম্বে সাম্প্রদায়িক হামলায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি জগদীশ চাকমা তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, পাহাড়ি মানুষ যেমন কোনো বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের সমর্থন করে না তেমনি সাম্প্রদায়িক হামলারও বিরোধিতা করে। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ধর্ষণের দায়ে ২ বছর কারাবন্দী ছিলেন, তিনি কিভাবে বহাল তরিয়তে এখনো শিক্ষক থাকতে পারেন। কেন সেই শিক্ষকরূপী পশুকে যথাযথ বিচারের আওতায় নিয়ে আসা হয়নি। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে পাহাড়ে ঘটে যাওয়া ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শহরে বসবাসরত আদিবাসী জনগণের উপড় প্রতিনিয়ত হুমকিধামকি দেওয়া হচ্ছে। আজকে এ ব্যাপারে প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তিনি বলেন, রাষ্ট্র যদি অসাম্প্রদায়িক, মানবিক হয় তাহলে আদিবাসীদের উপর সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলাগুলোর বিচার করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজু ভাস্কর্যে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশটি সভাপতির বক্তব্যের পরে প্রতিবাদী মিছিল আকারে গিয়ে শাহবাগে সমাপ্ত হয়। সমাবেশটির সঞ্চালনা করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগরের তথ্য ও প্রচার সম্পাদক হ্লামংচিং মারমা।

বরকলে পিসিপি'র কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, সোমবার "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হউন" শ্লোগানে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), বরকল শাখার ২২তম শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রুমেন চাকমা। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন চাকমা এবং সাবেক ছাত্র নেতা দেবপ্রিয় চাকমা। সভায় মিন্টু চাকমার সভাপতিত্বে সঞ্চালনা করেন ইলেন চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বরকল থানা শাখার সদস্য মহেন্দ্র চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রুমেন চাকমা বলেন, জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জুম্ম জনগণকে একত্রিত করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। এই সংগ্রামে ছাত্র সমাজ সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করতে বাধ্য করে। দীর্ঘ ২৭ বছরেও বাংলাদেশ সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করেনি, বরং সরকার আরও পাহাড়ী আদিবাসীদের অতীতের দিকে ধাবিত করতে বাধ্য করছে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করবে না। তাই তরুণ ছাত্রদের অধিকতর আন্দোলনে সামিল হওয়ার লক্ষ্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে অতিথি সুমন চাকমা বলেন, পাহাড়ে আগের মতো এখনও সেনাশাসন চলমান রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সকল সমস্যা আছে তা নিরসনের লক্ষ্যে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে আজ পাহাড়ের যে করুন অবস্থা তৈরি হয়েছে তা দিবালোকের মতো পরিষ্কার। শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন বাধাগ্রস্ত করার জন্য বিভিন্ন দল উপদল তৈরি করে পাহাড়ে ভাগ কর, শাসন কর নীতি প্রয়োগ করে চলেছে। তাই বর্তমান ছাত্র সমাজ ভুল পথে না হেঁটে সঠিক আদর্শিক লড়াই সংগ্রামে সামিল হয়ে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে।

সাবেক ছাত্র নেতা দেবপ্রিয় চাকমা বলেন, বর্তমান ছাত্র সমাজকে লেখাপড়ার পাশাপাশি জাতির জন্য কাজ করা প্রয়োজন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান পরিস্থিতি বিবেচনায় বাস্তবমুখী বাস্তবতার নিরিখে আত্মমুখী প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান।

আলোচনা সভা শেষ পর্যায়ে মিন্টু চাকমাকে সভাপতি, ইলেন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও মহেন্দ্র চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে একটি নতুন কমিটি গঠন করা হয় এবং নবগঠিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য সুমন চাকমা। রিন্টু চাকমাকে সভাপতি, রিনেল চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও হৃদয় চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে গঠিত পিসিপি'র বরকল রাগীব রাবেয়া কলেজ শাখার ১ম কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান বরকল থানা শাখার সহ সভাপতি ইলেন চাকমা।

> আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাই-বোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগযুগান্তের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সংরক্ষণের অধিকার দেবে। – ***মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা***

> '...সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনদের কথা এখানে নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে।'
>
> – ***মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা,*** *(২৫ অক্টোবর ১৯৭২ সংবিধান বিলের উপর আলোচনা)*

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss.org